শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ

সুহৃদ্বরেষু

॥ এক ॥

নিচের তলায় পাশাপাশি দু'খানা ঘর। একখানি বেশ বড় হলঘর। তার কোলে অপেক্ষাকৃত ছোট একখানা ঘর। হলঘর-খানি সোফা সেত্তি-কৌচে সাজানো। দেয়ালের গায়ে উঁচু উঁচু আলমারী—আইনের বইতে ঠাসা।

অর্থাৎ অপূর্ব উকিল।

কিন্তু সেটা নামমাত্র। আসলে এই বাড়ি, ওই আলমারী-ভর্তি সোনার-জলে বাঁধানো বই, এই ঐশ্বর্য সবই রায়বাহাদুর সতীনাথ মজুমদারের। তিনি ছিলেন পুলিশ-কোর্টের সরকারী উকিল। দীর্ঘ জীবনে প্রভূত অর্থ রোজগার করে গেছেন।

তার ফল হয়েছে এই যে, অপূর্ব অর্থোপার্জনের আগ্রহ অনুভব করার ফুরসুদই পেল না। যে ঘরে এই মুহূর্তে সে বসে রয়েছে সেই ঘরে রায়বাহাদুর যখন মক্কেল নিয়ে আর আইনের বই নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতেন এবং পাশের হলঘরে বিপর্যস্ত অন্য মক্কেলেরা নিরুপায় ধৈর্যের সঙ্গে নিঃশব্দে অপেক্ষা করত, অপূর্ব তখন অন্য একটা ঘরে চুপি চুপি বসে ইংরিজি সাহিত্য অধ্যয়ন করত। অথচ তখন সেও উকিল হয়েছে।

বন্ধুরা এবং হিতৈষী আত্মীয়েরা অপূর্বর সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। গৃহিণীও মাঝে মাঝে অনুযোগ করেছেন। রায়বাহাদুর হেসেছেন ঃ

অনেক ছ্যাঁচড়ামির পয়সা, গিন্নী। একমাত্র ছেলে। ওর জন্যে যা রেখে যাচ্ছি তাতে ও আর এসব ছ্যাঁচড়ামি নাই করল। বদ

খেয়াল তো কিছু নেই। বাতিকের মধ্যে বই কেনা আর পড়া। সেটুকু ও নিজের রোজগারেই করে।

গৃহিণী গালে হাত দেনঃ পড়া তো অনেক হল, এখনও পড়বে কি গো! যে বয়সের যা। এখন মুঠো মুঠো টাকা আনবে, তবে না ভালো লাগবে। তোমার ছেলে, একটু খাটলে ওর পসার জমতে কতক্ষণ!

রায়বাহাদুর মনে মনে হেসেছিলেন কিন্তু মুখে জবাব দেননি। তিনি জানতেন, বড় বাপের ছেলে হলেই বড় হওয়া যায় না। বরং সেইটেই বড় হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা।

রায়বাহাদুর নিজে বড় বাপের ছেলে ছিলেন না। নিজেই বড় হয়েছিলেন। অপূর্ব বড় বাপের ছেলে হয়ে জন্মেছিল। কিন্তু বড় হতে পারলে না। ওকালতি তার ভালোই লাগে না। অর্থোপার্জনের কোনো আগ্রহই নেই। এবং, কি জানি কেন, রায়বাহাদুর নিজেও ওকালতিতে এবং অর্থোপার্জনে তার আগ্রহ আকর্ষণের চেষ্টাও করেননি। গৃহিণীর চাপাচাপিতেও না।

আইন পাস করার পর অপূর্ব প্রথম প্রথম বাপেব গাড়িতে তাঁর সঙ্গেই কোর্টে যেত। কয়েক বৎসর পর যখন দেখা গেল কিছু কিছু ছোট মামলা ছাড়া আর কিছুই সে করবে না, তখন রায়বাহাদুর তাকে একখানা গাড়ি কিনে দিলেন। সে নিজের খেয়াল-খুশিতে কোর্টে যেত, খুশিমতো চলেও আসত। বাপের সঙ্গে সকাল-সকাল যাওয়া-আসার দুর্ভোগ থেকে বেঁচে গেল।

তারপর বাপ-মা একদিন গত হলেন। নগদ অর্থ এবং সম্পত্তির পরিমাণ দেখে অপূর্ব আশ্বস্ত হল। আর জীবনে উদরান্নের জন্যে চিন্তার কোনো কারণ নেই। বিপর্যয় কিছু না ঘটলে তার জীবন-যাত্রার রথ এমনি নির্বিঘ্নে গড় গড় করে চলে যাবে।

অপূর্ব নিশ্চিন্তে সাহিত্য-অধ্যয়নে মন দিলে।

পাশের মক্কেলদের অপেক্ষা-হলটি খালি হয়ে গেল। বাপের

পুরোনো মক্কেলদের কিছু-কিছু মাঝে-মাঝে আসে ছোটখাটো মামলা নিয়ে। পুরোনো সম্পর্ক তারা বোধ হয় একেবারে ভুলতে পারেনি।

আর যে ছোট ঘরটিতে রায়বাহাদুর মামলার সূত্র ধরে টানাটানি করতেন সেখানে নিরিবিলি নিশ্চিন্ত বসে অপূর্ব অধ্যয়ন করে দেশী এবং বিদেশী সাহিত্য। সেইগুলো অধিকার করেছে তার আলমারী, ঘূর্ণ্যমান সেল্‌ফ্‌, এমনকি টেবিলটি পর্যন্ত। সেখানে যত রাজ্যের সাময়িক পত্র-পত্রিকা।

যখন মক্কেল আসে, টেবিলে বসে। নইলে তার পিছনে একখানা আরাম-কেদারা, সেইখানে আড়ালে বসেই সে পড়াশুনা করে।

কোর্টে যায়, কিন্তু মামলার আকর্ষণ তত নয়, যত আড্ডার আকর্ষণে।

আজ সকালেও অপূর্ব সেইখানে বসে পড়া করছিল, টেবিলের আড়ালে সেই আরাম-কেদারায়। পাশের হলঘর থেকে অনেকগুলি কণ্ঠের গুঞ্জন উঠছিল। ওদের সে চেনে না। বড় একটা ছ্যাখেও না। রোজ সকালে-বিকেলে-সন্ধ্যায় ওরা আসে, কোনো কোনো দিন চা-খাবারও খায়। ওরা তার মক্কেল নয়, তার স্ত্রী সুমিত্রার সহকর্মীদল।

রোজ আসে, আজও এসেছে। ওদের জন্যে তার পড়ায় বিঘ্ন হচ্ছিল না। আপনমনে সে পড়েই চলছিল। হঠাৎ সিঁড়িতে উঁচু-হিলের জুতোর শব্দে যেন মুহূর্তের জন্যে একটু উচ্চকিত হয়ে উঠল।

কিন্তু তখনই মনে হল সুমিত্রা এ-ঘরে নাও আসতে পারে। হয়তো দলবল নিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে হলঘর দিয়ে। এই ভেবে তখনই আবার পড়ায় মন দিলে।

সুমিত্রা কিন্তু সদলবলে সোজা বেরিয়ে গেল না। পর্দা ঠেলে এই ঘরে এল।

গট গট করে এসে দাঁড়াল তার একান্ত সন্নিকটে, আরাম-কেদারার পাশে।

—শতখানেক টাকা দাও দিকি।

কথাটা বোধ হয় অপূর্বর কানে গেল না। সন্থস্নান এবং প্রসাধনের ফলে সুমিত্রার সুন্দর মুখখানি যেন চাঁদের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। পরনে টকটকে লাল শাড়িতে তনুদেহ যেন প্রদীপের মতো জ্বলছে।

সুমিত্রা আশ্চর্য, সকল সময়ই তার রূপ যেন নতুন মনে হয়। কিছুতেই একঘেয়ে মনে হয় না। যখনই ছ্যাখে, যেন নতুন সুমিত্রা, অন্য সুমিত্রা। কিছুক্ষণ চেয়ে দেখতে হয়।

তাকে দেখে পুরুষের চোখে যে বিস্ময় ফুটে ওঠে তা সে জানে। নিজের রূপ সম্বন্ধে সে নিজেও সচেতন।

অপূর্বর কাছে জবাব না পেয়ে সে হেসে ফেললে। বিজয়িনীর হাসি।

ঠোঁট দু'খানি ছুরির মতো বেঁকিয়ে, ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে, শুনতে পেলে না?

এতক্ষণে অপূর্বর সম্বিত ফিরে এল: অ্যাঁ?

—টাকা চাইছি।

—কত টাকা?

অপূর্ব চাবি নিয়ে ড্রয়ার খুলল।

সুমিত্রা বললে, শতখানেক।

—শতখানেক?

অপূর্ব একটু থামল। টাকা ড্রয়ারে আছে, কিন্তু এখনই কয়েকজন পাওনাদার আসবে। তাদের আসতে বলে দেওয়া হয়েছে। ফেরানো ঠিক হবে না!

বললে, ক'দিন আগে তো দু'শো টাকা নিলে।

—হ্যাঁ। আজ একশো নোব।

সুমিত্রা সগর্বে হাসলে।

অপূর্ব ড্রয়ার খুলে ম্যানিব্যাগটা নিঃশব্দে বার করলে।

—ওই তো অনেক টাকা রয়েছে।

ওর বোধ হয় ভয় হয়েছিল, অপূর্বর কাছে টাকা নেই। তাহলে মহামুস্কিলে পড়ত। এখনই সদলবলে যাচ্ছে কলকাতার বাইরে। খরচ আছে।

অপূর্ব কুণ্ঠিতভাবে বললে, টাকা আছে। কিন্তু এখনই জনকয়েক পাওনাদার আসবে।

—তাদের কাল দিও।

—আজ আসতে বলেছি। ফেরানো কি ঠিক হবে?

—চেক দিও বরং।

অগত্যা। কোর্টের পেয়াদাকে ফেরানো যায়, কিন্তু সুমিত্রাকে ফেরানো যায় না।

দশখানা দশটাকার নোট সুমিত্রার হাতে দিতেই সে খপ্ করে নিয়ে তার ভ্যানিটি-ব্যাগে পুরে ফেলে যাবার জন্যে পা বাড়ালে।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করলে, কতদূর যাবে?

সুমিত্রা বললে, এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে একটা গ্রামে।

—খাওয়া-দাওয়া?

—সে-কথা ভাবিনি। যা জুটবে।

গৌরবে সমাজসেবিকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—ফিরবে কখন?

—কি জানি।

সুমিত্রা চলে যাচ্ছিল। কিন্তু তখনই ফিরে এসে ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে চুপি চুপি বললে, না ফিরলে কি হয়?

অপূর্ব হাসলেঃ ভালো হয় না।

সুমিত্রা মুখখানা গম্ভীর করে বললঃ ওদিকে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ

হয়েছে, তার সঙ্গে মহামারী। মানুষ মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সাজানো ড্রইং-রুমের বাইরে মানুষ কি দুঃখে আছে দেখতে যাবে?

—না।

—না কেন? কোর্টে কি কোনো কঠিন মামলা আছে?

অপূর্ব আঘাতটা গায়ে মাখলে না। হেসে বললে, কোর্টে কঠিন মামলা আমার কখনই থাকে না। হালকা মামলা থাকে বটে, তাও ক্বচিৎ-কখনও।

—তবে? অন্য কোনো জরুরী বৈষয়িক কাজ আছে?

—তাও না।

—তবে? দিনরাত্তির বই মুখে নিয়ে বসে না থেকে চল না বাইরের পৃথিবীকে একটু দেখে আসবে।

সশব্দে দেরাজটা বন্ধ করে অপূর্ব বললে, না।

—কেন?

—কারণ হুজুগ জিনিসটা আমি স্বভাবত এড়িয়ে চলি।

—হুজুগ!—সুমিত্রা ভীষণ রেগে গেল,—মানুষের দুঃখে মানুষের বুক দিয়ে পড়াকে বল হুজুগ?

স্বামীর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে সুমিত্রা আরও রেগে গেল। বললে, তুমি যা খুশি মনে করতে পার, কিন্তু বিশ্বসুদ্ধ মানুষ জানে এটা হুজুগ নয়। সেদিন 'এলিটে' আমরা যে টাকাটা তুললাম, সেটা হুজুগ নয়, দেশসেবা।

অপূর্ব বই তুলে নিয়ে পড়া আরম্ভ করেছিল। সুমিত্রার কথা শুনে মুখ না তুলেই হাসলে।

দেখে সুমিত্রা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল: হাসলে যে! কেন হাসলে?

এবারে অপূর্ব মুখ তুলে সোজা সুমিত্রার দিকে চাইলে। সে-দৃষ্টিতে উষ্মা ছিল না, বিরক্তিও ছিল না। বরং যেন করুণায় কোমল।

অপূর্ব বললে, তুমি রাগ কোর না, সুমিত্রা। কিন্তু যে দেশে দুঃখে করুণা আকর্ষণের জন্য নাচ দেখাতে হয়, নইলে করুণা আসে না, সে-দেশে সমাজসেবা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়!

—বিড়ম্বনা!

সুমিত্রা কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল।

অপূর্ব বললে, হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আর কথা বোলো না। ট্রেনের হয়তো দেরি নেই।

—না। আমি যাই। তোমার মতো নিষ্কর্মা লোকের সঙ্গে তর্ক করাই বিড়ম্বনা।

সুমিত্রা গট গট করে বেরিয়ে গেল। অপূর্ব নিঃশব্দে আবার পড়ায় মন দিলে।

সুমিত্রা সম্বন্ধে অপূর্বর অপরিসীম দুর্বলতা!

প্রথমা স্ত্রী গত হবার পর অপূর্ব অনেকদিন বিবাহ করেনি। তার মনটা ভেঙে গিয়েছিল। শুধু তারই নয়, তার বাপ-মায়েরও। বড় ভালো মেয়ে ছিল অপর্ণা। অত্যন্ত নিরীহ, অত্যন্ত হাসি-খুসি এবং অত্যন্ত সরল স্বভাবের মেয়ে।

রায়বাহাদুর ছিলেন অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজের লোক। কারও কাজ তার পছন্দ হত না। চাকর-বাকর দূরের কথা, গৃহিণী পর্যন্ত তাঁর কাছে সহজে ভিড়তেন না।

অপর্ণা এসে দেখতে দেখতে তাঁকে মুঠোর মধ্যে এনে ফেললে। বুঝে ফেললে, তিনি কোন্ চুরুট ভালোবাসেন, কোন্ সিগারেট। কোর্টে যাবার সময় তাঁর বাক্সে ক'টি চুরুট দিতে হবে, সিগারেট-কেসে ক'টি সিগারেট।

নিজের হাতে একটি-দুটি রায়বাহাদুরের প্রিয় রান্না করা চাই। এবং তা সামনে বসে খাওয়ানো।

খাবার সময় রায়বাহাদুরের মুখ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকত। অপর্ণা আসার পরে মেঘ কেটে গেল।

হয়েছে, তার সঙ্গে মহামারী। মানুষ মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সাজানো ড্রইং-রুমের বাইরে মানুষ কি দুঃখে আছে দেখতে যাবে?

—না।

—না কেন? কোর্টে কি কোনো কঠিন মামলা আছে?

অপূর্ব আঘাতটা গায়ে মাখলে না। হেসে বললে, কোর্টে কঠিন মামলা আমার কখনই থাকে না। হালকা মামলা থাকে বটে, তাও ক্কচিৎ-কখনও।

—তবে? অন্য কোনো জরুরী বৈষয়িক কাজ আছে?

—তাও না।

—তবে? দিনরাত্তির বই মুখে নিয়ে বসে না থেকে চল না বাইরের পৃথিবীকে একটু দেখে আসবে।

সশব্দে দেরাজটা বন্ধ করে অপূর্ব বললে, না।

—কেন?

—কারণ হুজুগ জিনিসটা আমি স্বভাবত এড়িয়ে চলি।

—হুজুগ!—সুমিত্রা ভীষণ রেগে গেল,—মানুষের দুঃখে মানুষের বুক দিয়ে পড়াকে বল হুজুগ?

স্বামীর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে সুমিত্রা আরও রেগে গেল। বললে, তুমি যা খুশি মনে করতে পার, কিন্তু বিশ্বসুদ্ধ মানুষ জানে এটা হুজুগ নয়। সেদিন 'এলিটে' আমরা যে টাকাটা তুললাম, সেটা হুজুগ নয়, দেশসেবা।

অপূর্ব বই তুলে নিয়ে পড়া আরম্ভ করেছিল। সুমিত্রার কথা শুনে মুখ না তুলেই হাসলে।

দেখে সুমিত্রা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল: হাসলে যে! কেন হাসলে?

এবারে অপূর্ব মুখ তুলে সোজা সুমিত্রার দিকে চাইলে। সে-দৃষ্টিতে উষ্মা ছিল না, বিরক্তিও ছিল না। বরং যেন করুণায় কোমল।

অপূর্ব বললে, তুমি রাগ কোর না, সুমিত্রা। কিন্তু যে দেশে দুঃখে করুণা আকর্ষণের জন্য নাচ দেখাতে হয়, নইলে করুণা আসে না, সে-দেশে সমাজসেবা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়!

—বিড়ম্বনা!

সুমিত্রা কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল।

অপূর্ব বললে, হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আর কথা বোলো না। ট্রেনের হয়তো দেরি নেই।

—না। আমি যাই। তোমার মতো নিষ্কর্মা লোকের সঙ্গে তর্ক করাই বিড়ম্বনা।

সুমিত্রা গট গট করে বেরিয়ে গেল। অপূর্ব নিঃশব্দে আবার পড়ায় মন দিলে।

সুমিত্রা সম্বন্ধে অপূর্বর অপরিসীম দুর্বলতা!

প্রথমা স্ত্রী গত হবার পর অপূর্ব অনেকদিন বিবাহ করেনি। তার মনটা ভেঙে গিয়েছিল। শুধু তারই নয়, তার বাপ-মায়েরও। বড় ভালো মেয়ে ছিল অপর্ণা। অত্যন্ত নিরীহ, অত্যন্ত হাসি-খুসি এবং অত্যন্ত সরল স্বভাবের মেয়ে।

রায়বাহাদুর ছিলেন অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজের লোক। কারও কাজ তার পছন্দ হত না। চাকর-বাকর দূরের কথা, গৃহিণী পর্যন্ত তাঁর কাছে সহজে ভিড়তেন না।

অপর্ণা এসে দেখতে দেখতে তাঁকে মুঠোর মধ্যে এনে ফেললে। বুঝে ফেললে, তিনি কোন্ চুরুট ভালোবাসেন, কোন্ সিগারেট। কোর্টে যাবার সময় তাঁর বাক্সে ক'টি চুরুট দিতে হবে, সিগারেট-কেসে ক'টি সিগারেট।

নিজের হাতে একটি-দুটি রায়বাহাদুরের প্রিয় রান্না করা চাই। এবং তা সামনে বসে খাওয়ানো।

খাবার সময় রায়বাহাদুরের মুখ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকত। অপর্ণা আসার পরে মেঘ কেটে গেল।

একদিন হাসতে হাসতে গৃহিণীকে বলেছিলেন, আমার মা ফিরে এসেছেন গো। কম খেলে বেটী আমাকে ধমকায়।

সেই অবস্থা গৃহিণীরও। অপর্ণাকে না হলে এক মুহূর্ত তাঁরও চলত না। প্রতি ক্ষেত্রে অপর্ণার সঙ্গে পরামর্শ। প্রত্যেক বিষয়ের ভার অপর্ণার উপর।

সেই অপর্ণা যখন চলে গেল তখন বাড়িতে যে শোকের অন্ধকার নেমে আসবে সে তো স্বাভাবিক। রায়বাহাদুর এবং তাঁর গৃহিণী অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন।

কিন্তু তার চেয়ে বেশি আঘাত পেলেন একমাত্র পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে। তার ভাবগতিক ভালো মনে হল না। কিছুকাল পরে তাঁরা পুত্রবধূর শোক ভুলে পুত্রের জন্যে চিন্তিত হলেন। একমাত্র পুত্র, সে আর বিয়ে করবে না? এ বাড়িতে ছেলেমেয়ে হাসবে না?

তাঁরা চিন্তিত হলেন। ছেলেকে প্রথমে পরোক্ষভাবে, তারপরে প্রত্যক্ষভাবে চাপ দেওয়া হতে লাগল। মায়ের অশ্রুজল, স্নেহময় গম্ভীর পিতার বিষণ্ণ মুখ কিছুই কোনো কাজে এল না।

অপূর্ব একদিন স্পষ্ট তার মাকে বললে, আমি তোমাদের ছেলে। বাড়ির এক কোণে নিঃশব্দে পড়ে আছি। তাও কি তোমরা চাও না? আমি কি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব?

এর পরে আর কথা নেই।

কর্তা গৃহিণী উভয়েই হাল ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু বিধাতার কাজ দুর্জ্ঞেয় পথে চলে।

বন্ধুমহলে পড়াশুনা-করা সাহিত্যরসিক হিসাবে অপূর্বর খ্যাতি আছে। ওর একটি বন্ধু একদিন অপূর্বকে টেনে নিয়ে গেল তাদের ক্লাবে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক বুঝিয়ে দেবার জন্যে।

এসব বিষয়ে অপূর্বর উৎসাহ ছিল। অভিনয় সম্বন্ধে অবশ্য বেশি নয়, নাটকের সাহিত্যবস্তু সম্বন্ধে।

অপূর্ব গেল এবং কয়েকদিনের যাওয়া-আসা ও আলোচনায় যে-

মেয়েটি তাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করল সে সুমিত্রা। সুমিত্রা ভালো অভিনয় করে, ভালো গান গায় এবং নাচে,— তাই নয়, তার রসবোধও যথেষ্ট।

খুব যে বেশি পড়াশুনা করেছে তা নয়! খুব যে বেশি ভেবেছে তাও নয়! কিন্তু তার প্রকৃতিগত একটা রসবোধ আছে যার জন্যে কোনটির মধ্যে শ্রী, কোনটির মধ্যে সৌন্দর্য এবং কোনটির মধ্যে শালীনতা আছে সহজেই ধরতে পারে।

নাচের একটা ভঙ্গী অপূর্ব কিছুতেই ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না, বোঝাতে পারছে না, সুমিত্রা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বললে, দেখুন তো। এই রকম হতে পারে কিনা?

প্রশংসায় অপূর্বর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: ঠিক এই ভঙ্গীটির কথাই সে বলতে চাচ্ছিল!

সুমিত্রাকে তার ভালো লাগল।

অর্থাৎ অভিনয় চুকে যাবার পরেও সুমিত্রার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হল না।

ছিন্ন হলনা অপূর্বর উৎসাহে তা কিন্তু ঠিক নয়। প্রয়োজন এবং উৎসাহ সুমিত্রার দিক থেকেই বেশি। সুমিত্রার অপূর্বকে প্রায়ই প্রয়োজন পড়তে লাগল। আজ এজন্যে, কাল ওজন্যে, তার পরের দিন অন্য একটা কিছুর জন্যে।

অপূর্ব ঘন ঘন ডাকে সাড়া দিতে কোনো অনিচ্ছা অনুভব করলে না। ডাক এলে যায়। বসে সুমিত্রার সঙ্গে গল্প করে, নানা বিষয়ে আলোচনাও হয়। আলোচনার বিষয় প্রথমে গুরু, তার পরে লঘু, তারপরে নিতান্তই খোশগল্প।

দেখতে দেখতে পরিচয় হল সুমিত্রার মায়ের সঙ্গে, তার ভাই-বোনেদের সঙ্গে এবং আরও কিছুদিন পরে তার বাপের সঙ্গেও।

অত্যন্ত স্নেহশীলা বাঙালী জননী। উপর্যুপরি কয়েকদিন অপূর্ব না এলে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান।

কোনো কোনো দিন সুমিত্রার নিজের হাতের রান্না বিশেষ কোনো খাবার।

মাঝে মাঝে সুমিত্রা তাকে সিনেমায় টেনে নিয়ে যায়। অথবা কোনো নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠানে। কখনও অপূর্বর গাড়িতে কাছাকাছি কোথাও প্রমোদ-ভ্রমণে।

মা কখনই ওদের সঙ্গে যেতেন না। বোনেরা কখনও সঙ্গী হত, কখনও বা জরুরী প্রয়োজনে সঙ্গে যেতে পারত না। সেসব দিন শুধু ওরা দু'জনে।

তার পরে, তার বেশ কিছুদিন পরে, সুমিত্রার বাবা এলেন রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে, একটা ছুটির দিনে যেদিন মক্কেলের ভিড় থাকে না।

একথা-সেকথার পরে ভদ্রলোক যখন বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন রায়বাহাদুর যেন আকাশ থেকে পড়লেন। অপর্ণার মৃত্যুর পর থেকে কত মেয়ের বাপ-মা এসেছেন তাঁর লোভনীয় পুত্রের জন্যে। কত ঘটক। তাঁদের সবাই একে একে নিরাশ হয়ে ফিরে যাবার পর, এদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ একি!

একটু ইতস্তত করে রায়বাহাদুর বললেন, কি জানেন, ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু ছেলে একেবারেই অনিচ্ছুক।

একটু মিষ্টি হেসে সুমিত্রার বাবা বললেন, এখানে বোধ হয় অনিচ্ছুক হবে না।

রায়বাহাদুর অবাক ঃ কি করে জানলেন?

একটু ইতস্তত করে সুমিত্রার বাবা বললেন, জানি। আপনি অপূর্বকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।

রায়বাহাদুর পুলিশ-কোর্টের নামজাদা উকিল। ব্যাপারটা বুঝলেন। তিনি রাগবেন, কি কাঁদবেন, কি হাসবেন স্থির

করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত হেসেই ভদ্রলোকের দিকে চাইলেন।

বললেন, সে বিষয়ে যদি নিশ্চিত থাকেন তাহলে আমার অসম্মতি নেই।

—তাহলে একটা দিন স্থির করা প্রয়োজন।

—হ্যা। কাছাকাছি একটা দিন স্থির হোক। এখনকার ছেলেদের বিশ্বাস নেই, বুঝলেন? কখন বেঁকে বসেন কেউ জানে না।

সুমিত্রার বাবা মনে মনে হাসলেন। তার জো নেই। ছেলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

প্রকাশ্যে বললেন, যা বলেছেন!

রায়বাহাদুর খুব খুশি হয়ে উঠলেন। উচ্চহাস্য করে বললেন, কি বলিনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তখনই পাড়ার ভট্টাচার্য মহাশয়কে ডাকা হল। তিনি পঞ্জিকা নিয়ে এলেন। কাছাকাছি একটা দিনই স্থির হল।

গৃহিণীর কাছে কর্তা অবিলম্বে কথাটা বললেন। প্রথম এক চোট তিনি খুবই খুশি হলেন। কিন্তু তখনই বিমর্ষভাবে বললেন, কিন্তু ব্যাপারটা কিরকম যেন মনে হচ্ছে, না?

—ত্যাখো গিন্নি, অপু বিয়ে না করার চেয়ে এ ভালো নয়?

—মেয়ে দেখতে যাবে না?

—না। কারণ যে বিয়ে করবে সে নিজেই দেখেছে।

—দেনা-পাওনা?

রায়বাহাদুর হো হো করে হেসে উঠলেন: ভদ্রলোকের চেহারা দেখে সে সাহস আর হল না।

॥ দুই ॥

সুমিত্রার প্রতীক্ষায় অপূর্ব কিছুক্ষণ জেগে ছিল। তারপর কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ছাখে, পাশের খাটে সুমিত্রা অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

কে জানে ফিরতে তার কত রাত্রি হয়েছিল। যেমন অসাড়ে ঘুমুচ্ছে তাতে মনে হয়, রাত বেশিই হয়েছিল।

প্রসাধিত অবস্থায় ধরা যায় না, কিন্তু এখন অপূর্ব দেখলে, এই প্রথম দেখলে বলা যায়, সুমিত্রার চেহারা কিছুটা খারাপ হয়েছে। মুখের লাবণ্য ম্লান। ঘুমন্ত মুখখানি রক্তহীন, কাগজের মতো সাদা। চোখের কোলে কালির রেখা। মসৃণ ললাটে ঈষৎ রুক্ষতা।

এই ঘোরাঘুরির জন্যে বোধ হয়।

মেয়েদের দুর্বল দেহ, সূক্ষ্ম স্নায়ুজাল এবং কমনীয় ত্বক বোধ হয় এই রোদে-বৃষ্টিতে ঘোরাঘুরির উপযোগী নয়। সুমিত্রার চেহারা খারাপ হয়েছে।

রাত্রে নিদ্রার সময় অপূর্ব পাখার হাওয়া সহ্য করতে পারে না। বোধ হয় সেইজন্যেই সুমিত্রা ফিরে এসে পাখাটা চালায়নি। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

অপূর্ব পাখাটা খুলে দিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে চলে গেল। একটু ঘুমুক বেচারা। যতক্ষণ পারে। ওর নিদ্রার বিশেষ প্রয়োজন।

কিন্তু কতক্ষণই বা ঘুমুতে পারবে। একটু পরেই হয়তো ওর দলবল এসে পড়বে। হতভাগারা ওকে দম নিতে দেয় না। দিনরাত চরকির মতো ঘুরিয়ে বেড়ায়।

কাজ, কাজ। কি যে কাজ ভগবান জানেন।

স্থমিত্রাদি।

যে ছোট তার তো বটেই, যে বড় তারও স্থমিত্রাদি! ছেলেমেয়ে সবাই ডাকে স্থমিত্রাদি। এতগুলো পাগল ছেলেমেয়ে স্থমিত্রাকে কেন্দ্র করে দিনরাত্রি কেন যে ঘোরে, কি কাজের তাগাদায় সে একটা বিস্ময়।

অপূর্ব তো ভেবে কূল-কিনারা পায় না।

বিস্মিত হয়, বিরক্তও হয়। অথচ স্থমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে কাকেও কিছু বলতেও পারে না। বস্তুত অত্যাচারটা শুধু স্থমিত্রার উপরই চলছে না, তার নিজের উপরও চলছে। তার নিচের তলাটা প্রায় মুসাফিরখানায় দাঁড়িয়ে গেছে।

একদল ছেলে আসেঃ স্থন্দর, স্থবেশ। পরনে ধোপদুরস্ত ট্রাউজার ও হাফশার্ট। হাতে সিগারেটের টিন।

আসে একদল মেয়েঃ রং-করা মুখ, চঞ্চল চোখ, অগোছালো চুল। সিল্কের শাড়ির আঁচল উড়ছে। একদল রঙিন প্রজাপতি যেন।

আসে মুহুর্মুহু চা-বিস্কিট। পাউডারের গন্ধে, সিগারেটের ধোঁয়ায় আর উচ্ছল তরঙ্গিত হাস্যে, যতক্ষণ থাকে, হলঘর আচ্ছন্ন করে রাখে।

অপূর্বর কাছে ও-ঘরটাই যেন বিষাক্ত হয়ে গেছে। ওরা থাক আর নাই থাক, ও-ঘরের দিকে উঁকি দিতেও অপূর্বর বিরক্তি বোধ হয়।

পাশের ছোট ঘরে অপূর্ব থাকলে ওরা সংযতভাবে থাকবার চেষ্টা করে। কিন্তু চেষ্টা করে সংযত থাকা কতক্ষণ সম্ভব? প্রথমে গুঞ্জন এবং তারপরে হট্টগোল আরম্ভ হয়। অপূর্ব তখন বিরক্তভাবে দোতলার লাইব্রেরী-ঘরে চলে যায়।

ওরা বুঝতে পারে অপূর্ব তাদের আসা পছন্দ করে না। স্থমিত্রা বুঝতে পারে স্বামী বিরক্ত হন।

কিন্তু এ তার একটা খেলা এবং নেশা।

এই যে বহু তরুণ-তরুণীর দিদি, বহু লোকের পূজা এবং মুগ্ধ দৃষ্টি, কাজ আর অকাজের নেশা—তার বয়সে তার মতো সুন্দরী মেয়ের পক্ষে এ নেশা পরিত্যাগ করা অসম্ভব। সে জানে এতগুলি মুগ্ধ মানুষ দিবারাত্রি তাকে যে ঘিরে রয়েছে, এ শুধুই তার অর্থ আছে বলে নয়, রূপ আছে বলেও। জানে বলেই বোধ হয় নেশা আরও জমে গেছে।

সুমিত্রার ঘুম ভাঙলো তখন বেলা ন'টার কাছাকাছি।

হলঘর খালি। কালকের ধকল কাটিয়ে কেউ এখনও জমতে পারেনি। বিকেলের আগে পারবেও না।

চায়ের পেয়ালাটি হাতে করে সে অপূর্বর পড়বার ঘরে এল। মুখে ক্লান্ত হাসি।

বই থেকে মুখ তুলে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করলে, কাল কখন ফিরলে?

লজ্জিত হাস্যে সুমিত্রা বললে, রাত হয়েছিল। দেখলাম তুমি অঘোরে ঘুমুচ্ছ।

—অনেকক্ষণ জেগেই ছিলাম। তার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমার আসা টের পাইনি। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে খুব ধকল গেছে কাল।

—ধকল?— চায়ের পেয়ালায় একটা হালকা চুমুক দিয়ে সুমিত্রা বললে,—ধকল তো গেছেই কিন্তু আনন্দও পেয়েছি খুব। ওদের একটা বসন্ত-উৎসব ছিল।

অপূর্ব চমকে উঠল: বসন্ত-উৎসব! তুমি না বললে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীতে খুব কষ্ট পাচ্ছে ওরা!

—হাঁ। কঙ্কালসার মানুষগুলোর দিকে চাওয়া যায় না। তার জন্যে ওদের দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ সমিতিতে আমরা দুশো এক টাকা দিয়ে এলাম। কিছু পুরোনো কাপড়-জামাও বিতরণ করে এলাম। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে একটা বসন্ত-উৎসবের আয়োজনও করেছিল

ওখানকার সবুজ-সংঘ। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতিত্ব করেছিলেন। আর তার স্ত্রী পুরস্কার বিতরণ করলেন।

—কাদের ?

—যে ছেলেমেয়েরা 'ফাল্গুনী' অভিনয় করলে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে।

—ভালো অভিনয় করলে ?

একটু দ্বিধা করে সুমিত্রা বললে, খুব ভালো হয়তো নয়, কিন্তু স্থানীয় জমিদারের ছেলের ঠাকুর্দার অভিনয় বেশ ভালো হয়েছিল। আর দুটি মেয়ে চমৎকার নেচেছিল—তারা অবশ্য ওখানকার নয়।

—কোথাকার ?

—কলকাতা থেকে ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল।

—তাই নাকি।

—হ্যাঁ। ভদ্রঘরের মেয়ে, হয়তো স্কুল-কলেজে পড়ে, ভালো অভিনয় করতে পারে এমন মেয়ে প্রচুর পাওয়া যায়।

অপূর্ব বিস্মিত স্থির দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে চেয়ে রইল। সুমিত্রা তা টের পেলে কিনা জানি না। আপন মনেই বলতে লাগল :

দোষের কিছুই নয়। এইভাবে কিছু কিছু অর্থ মাঝে মাঝে তারা রোজগার করে। হয়তো নিজেদের পড়াশোনার খরচ কিছু ওঠে। আর একটু নাম করলে হয়তো সিনেমায় যাবে, কি হয়তো পেশাদার রঙ্গমঞ্চে। তখন অনেক টাকা রোজগার করবে। মন্দ কি ?

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করলে, সংসার করবে না ?

—সবাইকে সংসার করতে হবে, তার কি মানে আছে ? কেউ কেউ বিয়ে-থা করবে। সংসার করবেও হয়তো।

তা ঠিক। কিন্তু বহুকালের সংস্কারে অপূর্বর মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলে, খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল তো? না শুধুই নাচা-কোঁদা?

সুমিত্রা হাসলে: তুমি শুধু ওই একটি জিনিসই বোঝো!

—জিনিসটা যে অদরকারী নয়, আয়নাতে নিজের মুখখানা দেখলেই টের পাবে।

কথাটা উড়িয়ে দিয়ে সুমিত্রা বললে, ও কিছু নয়! ওটা রোদে ঘোরাঘুরি করার জন্যে। স্নান করলেই ঠিক হয়ে যাবে।

—যাবে না। ওটা একদিনের ব্যাপার নয়। সমাজসেবায় আমি বাধা দিচ্ছি না কিন্তু শরীরের দিকে একটু লক্ষ্য রেখ। যতখানি শরীরে সয়, ততখানিই ভালো। তোমার চেহারা অত্যন্ত বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে!

চেহারা সম্বন্ধে সুমিত্রার অনুরাগের অভাব নেই। মনে মনে সে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু প্রকাশ্যে উপেক্ষাভরে বললে, যাক্‌গে। কি হবে আর চেহারা নিয়ে!

সুমিত্রা শুষ্ক হাসি হাসলে।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে অপূর্ব বললে, তা বললে কি হয়! স্বাস্থ্য, রূপ মস্তবড় সম্পদ। বিশেষ করে মেয়েদের। ঘোরাঘুরিটা কমাও!

সুমিত্রা বললে, তোমার মতো সবাই তো ঘরের কোণে দিন-রাত্তির বই মুখে নিয়ে বসে থাকতে তে. পারে না। জীবনে কাজেরও দরকার আছে।

—ঘরের মধ্যে কি কাজ নেই?

—কি কাজ আছে?

—সংসারের কাজ কি সামান্য?

—সে তো ঠাকুর-চাকরের খবর্দারী। ও আমার ভালো লাগে না।

অপূর্ব কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দে সুমিত্রার দিকে চেয়ে থেকে আবার বইতে মন দিলে। ঘরের কাজ সুমিত্রা কখনও করেনি। আড্ডা

এবং হৈ-হুল্লোড়ই চিরকাল করে এসেছে। ওই তার প্রাণ। তার নিশ্বাসের মতো অপরিহার্য। ও ছেড়ে সে থাকতে পারে না।

অজ্ঞাতে বুকের ভিতর থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

মক্কেল থাক না থাক, প্রায় প্রত্যহই অপূর্ব কোর্টে একবার করে যায়। বার-লাইব্রেরীর আড্ডার আকর্ষণ প্রচণ্ড। কলিকাতা শহরের যত গল্প ও গুজব মানুষের মুখে মুখে পল্লবিত আকারে মনোহর হয়ে ওঠে এই বার-লাইব্রেরীতে। এর উপর বন্ধুজনসঙ্গের আকর্ষণও রয়েছে। তার মতন আরও কয়েকটি বড়লোকের ছেলে, যাদের অর্থোপার্জনের তেমন তাগিদ নেই, আসে। তিনটে পর্যন্ত গুলতানি হয়, তারপর যে যার বাড়ি চলে যায়।

সুমিত্রা চলে যাওয়ার পর অপূর্ব চোখের সামনে বই নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। পড়ায় মন বসল না। কোর্টে যাবার সময়ও হল। বই বন্ধ করে স্নানাহারের জন্যে উপরে উঠল।

সিঁড়ি থেকেই সুমিত্রার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঃ

—পটলের সের চোদ্দ আনা ? কে বাজার গিয়েছিল ?

—আমি।

রামধনের গলা।

—তুই চোদ্দ আনা সের পটল নিয়ে এলি ?

—আজ্ঞে, ওইরকমই দর।

এ গলাটা ঠাকুরের।

—ওইরকমই দর ! চালাকি পেয়েছ ? পটলের সের চোদ্দ আনা ? মাছের সের ছ'টাকা ! এ কি মগের মুল্লুক !

অপূর্বর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে সুমিত্রা কি সংসারধর্মে মন দিলে ? বাজারের হিসাব নিয়ে পড়েছে কেন ?

আর দু'ধাপ উপরে উঠতেই অপূর্ব দেখতে পেলে, একখানা

বেতের চেয়ারে সুমিত্রা। সামনে টিপয়ে খাতা পেনসিল। আর চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুর-চাকরের দল। তারা সবাই বিপর্যস্ত এবং বিব্রত।

অপূর্বকে দেখেই সুমিত্রা চীৎকার করে উঠল: তোমার চাকর গুলো হয়েছে চোরের সর্দার। হিসেবে যা দেখছি, শুধু বাজার থেকেই এরা দৈনিক অন্তত পাঁচটাকা মারে।

রামধন জোড়হাত করে বলতে গেল: আজ্ঞে বাবু।

সুমিত্রা ধমক দিলে, থাম তুই। আর কেঁদে সাধুগিরি দেখাতে হবে না। তোদের সব চালাকি আমি ধরে ফেলেছি।

অপূর্বর দিকে চেয়ে বললে, কাল একটু সকালে উঠিয়ে দিও তো। আমি নিজে বাজারে যাব।

—সে আবার কি?

—হ্যাঁ। মিসেস বোস নিজে গাড়ি নিয়ে বাজার করতে যান মিউনিসিপাল মার্কেটে। কাল থেকে আমিও যাব। এই দর যদি হয় ভালো, কম হলে, যে যে-দিন বাজারে গেছে তার মাইনে থেকে কাটব। চালাকি বের করে দিচ্ছি।

পরক্ষণেই ঈষৎ গলা নামিয়ে বললে, রোজই বা যেতে হবে কেন। রেফ্রিজারেটার আছে, একদিন বাজার করলে দু'দিন চলে যাবে। কাল সকালে আমাকে উঠিয়ে দিও তো। কিছু দেখবার সময় পাইনা বলে বাড়িটাকে যেন হোটেল বানিয়ে তুলেছে!

সুমিত্রা চেয়ার ছেড়ে উঠল: যাও, আর সাধু সেজে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থেক না। নিজের কাজে যাও।

ওরা চলে যেতে সুমিত্রা আবার বসল।

বললে, কী কাণ্ড! একেবারে পুকুর চুরি! মিসেস বোস প্রায়ই বলেন, বাজারটা নিজে করবেন। খেয়েও সুখ পাবেন, পয়সারও সাশ্রয় হবে। ঠিকই বলেন।

অপূর্বর বিস্ময়ে কথা বেরুচ্ছিল না। কোনোরকমে বললে, কিন্তু বাজার তো তুমি কখনও যাওনি।

—নাই গেলাম। বাজার কি চিনি না? তবে আর কি! সঙ্গে ওই চোরটাকেই নিয়ে যাব। দেখব, দাম শুনে মুখের অবস্থা কি হয়।

উত্তেজনায় সুমিত্রা নড়ে-চড়ে বসল।

অপূর্ব বললে, জিনিসটা ভালো। বাজারটা নিজেদেরই করা উচিত।

—নিশ্চয়। পয়সার জন্যে ওরা বাজারের যত ওঁচা জিনিস নিয়ে আসে। যেমন মাছ, তেমনি তরিতরকারী। রান্নার স্বাদ ছ্যাখো না, কি বিশ্রী!

রান্নার স্বাদ সম্বন্ধে অপূর্বর বিশেষ বোধ নাই। হাঁ, না, কি বলবে বুঝতে না পেরে সে বিব্রতভাবে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

সুমিত্রা বলতে লাগল: প্রত্যেকেরই বাজার যাওয়া উচিত। তোমারও।

—আমারও। আমি

অপূর্ব জলে পড়ল। সুমিত্রাকে সংসারধর্মে মন দিতে বলে একী বিপদ সে আনলে!

সুমিত্রা তৎক্ষণাৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, জানি তুমি পারবে না। তোমার বই আছে, বার-লাইব্রেরীর গুলতানি আছে। কত তোমার কাজ! আমাকেই যেতে হবে।

ব'লে আঁচলটা ঝনাৎ করে পিঠে ফেলে উঠে দাঁড়াল। অপূর্ব সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে, সুমিত্রার আঁচলে মস্তবড় একটা চাবির রিং!

কী আশ্চর্য! সুমিত্রা গৃহিণী হয়েছে!

॥ তিন ॥

পরদিন সকালে অপূর্বর যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা হয়েছে। সুমিত্রা তখনও অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। নিদ্রিত মুখে শিথিল শ্রান্তি। তাকে ডাকতে অপূর্বর ইচ্ছা হল না। সে নিজেই রামধনকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে বেরুল।

যখন ফিরল তখন সুমিত্রা বারান্দায় বসে খবরের কাগজখানা ওলটাচ্ছে।

সে যে বাজারে যেতে পারেনি, ঘুম থেকে উঠতেই পারেনি, এই লজ্জা তাকে বিঁধছিল। সেই লজ্জা ঢাকবার জন্যে অপূর্বকে দেখেই ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, আমাকে উঠিয়ে দিলে না কেন?

প্রসন্ন হাস্যে অপূর্ব বললে, তুমি এমন ক্লান্তভাবে ঘুমুচ্ছিলে যে, ডাকতে ইচ্ছা হল না।

সুমিত্রার লজ্জা ঢাকা পড়ল। ভিতরে বোধ হয় একটু খুশীও হল।

জিজ্ঞেস করলে, বাজারে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—পটলের সের কত নিলে?

—পটল! পটলের সের···ওরে রামধন!

—রামধনকে ডাকছ কেন? তুমি নিজে বাজারে যাওনি?

—নিজেই তো গিয়েছিলাম।

—গিয়েছিলে তো রামধনকে ডাকছ কেন? তুমি নিজে দর করনি?

মাথা চুলকে অপূর্ব বললে, করেছিলাম। কিন্তু কি জান, অনেকগুলো জিনিস, কোনটার কি দর বললে মনে করতে পারছি না।

অপূর্ব অপ্রস্তুতভাবে হাসতে লাগল।

সুমিত্রাও হেসে ফেললেঃ তোমার স্মৃতিশক্তি প্রখর, সন্দেহ নেই। কাল আমি যাব। বাজার থেকে কত পয়সা ওরা মারছে, এতদিন ধরে মেরে আসছে, তার একটা হিসাব দরকার। কাল এর হেস্তনেস্ত হবে। ঠাকুর!

ঠাকুর এসে দাঁড়াল।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, কি রান্না হচ্ছে?

যা যা রান্না হচ্ছে ঠাকুর জানালে।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে সুমিত্রা বললে, রান্না কি তোমাদের খুশিমতো হয়?

ঠাকুর বিস্মিতভাবে একবার অপূর্বর দিকে একবার সুমিত্রার দিকে চাইতে লাগল। কি জবাব দেবে ভেবে পেলে না।

সুমিত্রা বললে, কাল থেকে আমি নিজে বাজার যাব। যা যা রান্না হবে, আমায় জিজ্ঞেস করে হবে। বুঝলে?

বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে ঠাকুর চলে গেল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারলেও যেন খুশি হয়েই চলে গেল। রামধন বাবুর পেয়ারের চাকর। দু'হাতে চুরি করে আর সকলের উপর ছড়ি ঘোরায়। সুতরাং ওর উপর ঠাকুর, চাকর, ঝি সবাই মনে মনে চটা। প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস করে না।

ঠাকুর খুশি হল এই কারণে যে সুমিত্রা নিজে সমস্ত দেখাশোনা করলে, যেমন আগে গিন্নিমার আমলে ছিল, রামধনের ডাঁট অনেকখানি মরবে। তার নিজেরও হয়তো একটু অসুবিধা হবে। কিন্তু রামধন যে জব্দ হবে সেই আনন্দে ওইটুকু ক্ষতি সে সানন্দে স্বীকার করে নেবে।

অপূর্ব চুপ করে বসে সব শুনছিল। ঠাকুর চলে যেতে বললে, আজ আমার খুব আনন্দ হছে। ঠাকুর-চাকরের চুরি তুমি কতখানি বন্ধ করতে পারবে জানি না। হয়তো চুরির একটা দরজা তুমি বন্ধ করবে, আর পাঁচটা খুলে যাবে। সেজন্য নয়, কিন্তু তুমি যে

সংসারের দিকে মন ফেরালে এইটেই আমার আনন্দ।

শুনে সুমিত্রা মনে মনে বিগলিত হল।

বললে, তোমাকে সত্যি কথা বলি, এসব আমার ভালো লাগে না। এই চাল-ডাল-নুন-তেল, আলু-পটল-উচ্ছের হিসেব। ঠাকুর চাকরের সঙ্গে বকাবকি।

—কিন্তু আমার মা দেখছ তো তাই করে জীবন কাটিয়েছেন।

—সে এক কাল গেছে।

—গেছে কি? একেবারেই চলে গেছে?

একটু ভেবে সুমিত্রা বললে, না গেলেও, যাবে। যেতে বসেছে।

—মেয়েরা আর গৃহকর্ম দেখবে না? স্কুল-কলেজ থেকে ছেলে-মেয়েরা ফিরে এসে মায়ের হাতের তৈরী খাবার পাবে না? যে যে খাবারটি ভালোবাসে?

—কেউ কেউ পেতে পারে। সবাই পাবে না। মায়েদের সময় কই? তাদেরও তো বাইরের কাজ আছে।

অপূর্ব বললে, বাইরের কাজ পুরুষেরও আছে। তারা কি ঘরের কাজ করে না?

—অনেকে করে না। যেমন—সুমিত্রা হেসে বললে,—তুমি কর না। কেন কর না?

—ভালো লাগে না।

—ঠিক তাই। আমারও ঘরের কাজ ভালো লাগে না। তবু করব, শুধু— একটু থেমে, একটু মিষ্টি হেসে সুমিত্রা বললে,—শুধু তোমাকে খুশি করবার জন্যে।

সুমিত্রা উঠে পড়ল। সে চলে যাচ্ছিল। অপূর্ব তার হাত ধরে বসালে।

বললে, তাহলে শোন, আমিও আজ থেকে বাইরের কাজে মন দেব। শুধু তোমাকে খুশি করবার জন্যে। এই কথা রইল, কেমন?

—আচ্ছা।

প্র্যাকটিস জমাবার মূলধনের অভাব অপূর্বর ছিল না। নামকরা উকিলের ছেলে। দৈনন্দিন সংসারযাত্রা নির্বাহের অর্থের অভাবও নেই। অভাব ছিল শুধু ইচ্ছার। সেই ইচ্ছা এসে গেল দাম্পত্য প্রতিযোগিতায়।

বাপের পুরানো মক্কেল কিছু কিছু ছিল। অপূর্ব ব্যবসায় মন দিয়েছে শুনে তাদের কেউ কেউ স্বেচ্ছায় এসে গেল। কেউ কেউ বাপের আমলের পুরাতন মুহুরীর তদ্বিরে ফিরে এল।

রায়বাহাদুরের আলমারী-ভর্তি বইগুলোর আবার ঝাড়-পোঁছ হতে লাগল। যে সময়টা অপূর্ব সাহিত্যে দিচ্ছিল সেই সময়টা আইনের বই অধ্যয়নে নিয়োগ করতে লাগল। পিতৃবন্ধুরাও বেশ খানিকটা সাহায্য করতে লাগলেন।

অনবরত সাহিত্য-অধ্যয়নের ফলে অপূর্ব চিন্তাশীল এবং কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। বাস্তববুদ্ধি, এমনকি যাকে সাধারণ বুদ্ধি বলা হয় তাও নষ্ট হয়েছিল। মনে একটি অভিজাত আলস্য এসেছিল। অনুশীলনের সাহায্যে এবং ইচ্ছাশক্তির জোরে আবার তা ফিরে আসতে লাগল।

দেখতে দেখতে অপূর্ব কাজের লোক হয়ে গেল।

অর্থ যে খুব বেশি আসতে লাগল তা নয়। কিন্তু কিছু কিছু মক্কেল এল, কিছু কাজ এল, আর এল অনেকখানি উদ্যম।

অপূর্ব এখন প্রত্যূষে ওঠে। অফিস-ঘরে এসে বসে। মামলা থাকলে তার কাগজপত্র ছাখে, আইনের বই থেকে নোট নেয়, সাক্ষীদের তালিম দেয়। তারপর স্নানাহার সেরে কোর্টে বেরিয়ে যায়।

সর্তানুযায়ী সুমিত্রা নিজে বাজার যায়, রান্না কি হবে তার নির্দেশ দেয় এবং স্বামীর খাবার টেবিলে তার সামনে এসে বসে।

—বৈদ্যুতিক পাখা হয়ে গৃহিণীদের একটু অসুবিধা হয়েছে।

সুমিত্রা হাসতে হাসতে বললে।

বিস্মিতভাবে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করলে, অসুবিধেটা কি?

—স্বামীর খাবার সময় হাত-পাখা নিয়ে বসার প্রথাটা নষ্ট হয়ে গেছে।

অপূর্ব হেসে ফেললেঃ আমার একজন বন্ধু বলেন, প্রথাটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। তাঁর স্ত্রী একটি জাপানী হাত-পাখা নিয়ে তাঁর খাবার টেবিলে বসেন, কিন্তু হাওয়াটা নিজেকেই করেন।

দু'জনেই হেসে উঠল।

অপূর্ব মন্তব্য করলেঃ ভদ্রমহিলা নিষ্ঠাবতী এবং বুদ্ধিমতী।

—তাতে সন্দেহ নেই—সুমিত্রা বললে,—তুমিও কি আমাকে তাই করতে বল?

অপূর্ব বললে, আমি কিছুই বলি না। এসব পরের বলার কথাও নয়। যাঁর পোর্টফোলিও তাঁর নিজেকেই আবিষ্কার করে নিতে হয়। আবার একজন আবিষ্কার করে, পাঁচজন অনুসরণ করে। ইচ্ছা হলে তুমিও ভদ্রমহিলার অনুসরণ করতে পার।

—তার মানে জাপানী পাখা কোথায় পাওয়া যায় খোঁজ করতে হবে?

—নিশ্চয়ই। অথবা আধুনিকতর এবং সুদৃশ্যতম অন্য কোনো পাখা হলেও চলবে.

সুমিত্রা হেসে বললে, দেখি।

তারপর জিজ্ঞাসা করলে, তুমি আজ ফিরবে কখন?

—কেন বল তো?

—গাড়িখানা দরকার ছিল।

—ক'টায়?

—ছ'টায়।

অপূর্ব হেসে ফেললে ঃ যত প্র্যাক্‌টিসই করি, ছ'টা পর্যন্ত আমার জন্যে কোর্ট কখনই খোলা থাকবে না। তার আগে ফিরতেই হবে।

—না। কোর্ট থেকে আবার যদি অন্য কোথাও বেরিয়ে যাও তাই বলছিলাম। আমাদের ক্লাবের একটা জরুরী সভা আছে। যাওয়া বিশেষ দরকার।

হ্যাঁ। ক্লাব। সুমিত্রার যে ক্লাব আছে সে-কথা অপূর্ব ভুলেই গিয়েছিল।

অপূর্ব আজকাল প্রচুর খাটছে, তার চেয়ে বড় কথা, খেটে আনন্দ পাচ্ছে। যত খাটছে, তত পয়সা আসছে, নাম হচ্ছে, তত আনন্দ বাড়ছে।

শুধু যে পয়সার জন্যেই আনন্দ তা নয়। এক একটা এমন জটিল মামলা হাতে আসে যাতে মানব-চরিত্রের বিচিত্র প্রকাশ তার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। এতদিন বই পড়ে এসেছে। সেখানে কত বিচিত্র চরিত্রের দেখা পেয়েছে। কিন্তু বাস্তব চরিত্র যে পুঁথির চরিত্রের চেয়ে কত আশ্চর্য হতে পারে, ফৌজদারী কোর্টে তার পরিচয় পেয়ে তার তাক লেগে গেল।

সন্ধ্যার পর স্নানান্তে সুমিত্রাকে নিয়ে খোলা ছাদের বাগানে বসে। আর সেইসব গল্প করে,

—জান সুমিত্রা, আজ একটা আশ্চর্য মামলা হাতে এসেছে।

—কি রকম ?

—একটি লোক বিয়ে করে বছর পাঁচেক আগে। সুন্দরী স্ত্রী।

সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে, যত মুস্কিল সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে। বুঝলে ?

লজ্জায় সুমিত্রার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। বললে, তারপরে ?

—তার পরে একটি বন্ধু এসে জুটল। খুব বিশ্বস্ত বন্ধু, এক আত্মা বললেই চলে।

সুমিত্রা হাসলে : তারপরে ?

—তারপরে স্বামী-স্ত্রীতে মাঝে-মাঝেই খিটিমিটি বাধতে লাগল। বন্ধুটি মাঝে মাঝে আসে, দুজনের আবার মিটমাট করিয়ে দেয়, অনেকক্ষণ হাসি-গল্প চলে, তারপরে চলে যায়। এমনি মাঝে মাঝে চলে।

একদিন সকালে দাম্পত্য-কলহ বাধল। এমন কলহ যে স্বামী না খেয়েই অফিস চলে গেল। আর স্ত্রী উনুনে জল ঢেলে ঘরে শুয়ে পড়ল।

—কারোই খাওয়া হল না ?

—না। স্বামী টিফিনের সময় হয়তো কিছু খাবার খেলে, কিন্তু স্ত্রী জলবিন্দু না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মনের উত্তাপ উভয়েরই কমে আসছিল।

সুমিত্রা হেসে বললে, খুব স্বাভাবিক।

অপূর্ব বলে চলল : হ্যাঁ। মনের উত্তাপ কিছুটা কমতে স্বামীর মনে পড়ল স্ত্রীর কথা। অফিস ছুটি হবার মুখে গিয়ে দাঁড়াল তার বন্ধুর অফিসের গেটে। বন্ধু বেরিয়ে আসতেই তাকে ধরে নিয়ে এল নিজের বাসায়। পথে আসতে কিছু ভালো-ভালো জিনিস বাজার করলে। কিছু মিষ্টিও কিনলে স্ত্রী এবং বন্ধুর জন্যে।

বন্ধু আবার দুজনের মিল করিয়ে দিলে।

গল্প-গুজব আহারাদি শেষ হতে বেশ খানিকটা রাত্রি হয়ে গেল। অত রাত্রে বন্ধুকে আর ছেড়ে দিলে না।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, বন্ধুটি কি অবিবাহিত ?

—হ্যাঁ। ওদের অনুরোধ সে ঠেলতে পারলে না। রাত্রিটা রয়ে গেল।

মধ্যবিত্ত গরীব গৃহস্থ। একখানি মাত্র তাদের ঘর। দিনে সেটি বসবাস ঘর, রাত্রে শোবার ঘর। বারান্দার একপাশে একটি ছোট্ট রান্নাঘর। সুতরাং সেই একটি ঘরেই তক্তপোশের উপর স্ত্রী, আর নিচে একই বিছানায় তুই বন্ধু শুয়ে পড়ল।

রাত্রি তখন আন্দাজ তিনটে হবে। ঘুম ভেঙে স্বামী ত্থাখে বন্ধুটি তার পাশে নেই। মাথা তুলতেই সেই আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলে,

অপূর্ব থামল।

সুমিত্রা রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনে যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলে, কি দেখলে ?

—যা দেখলে, তাতে তার রক্ত মাথায় চড়ল। গৃহস্থালীর একটা দা ছিল কাছেই। সেইটে নিয়ে বসিয়ে দিলে বন্ধুর ঘাড়ে। রক্তের ফিনিক উঠল।

বৌটি জেগে উঠে চীৎকার করলে, কি করলে! ওগো কি করলে!

স্বামী তখন দা হাতে ছুটেছে তাকে শেষ করবার জন্যে। কিন্তু মেয়েটি অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি। তক্তাপোশের উপর এমন জায়গায় সে দাঁড়িয়ে যে স্বামী তাকে নাগাল পাচ্ছে না। তখন সে ছুঁড়ে মারলে দা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দা দেয়ালে লাগল।

মেয়েটি এক লাফে নেমে দরজা খুলে বাইরে পালাল। অন্য লোকেরা তার চীৎকারে উঠে পড়েছে। তারা ছুটে এসে স্বামীকে ধরে ফেললে।

পুলিশে খবর দেওয়া হল। আহত বন্ধুটিকে হাসপাতালে পাঠানো হল। কিন্তু সে আর বাঁচলে না। পুলিশ স্বামীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

এই হল ঘটনার মোটামুটি বিবরণ।

অপূর্ব থামল।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, স্বামীর ফাঁসী হয়ে যাবে নিশ্চয় ?

অপূর্ব হেসে বললে, খুব সম্ভবত বেঁচে যাবে।

—কি করে ?

—ঘটনাটা অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীর অনুকূলে মোড় ফিরে গেছে। বন্ধু তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে স্বামীকে বাঁচিয়ে গেল। বলে গেল, ব্যাপারটা যে কি, কে তার হত্যাকারী কিছুই সে বুঝতে পারছে না।

বুঝতে সে নিশ্চয়ই পেরেছিল। আঘাতের পরে সে দশ-বারো ঘণ্টা বেঁচেছিল। কিন্তু তবু সে তার ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কিছুতেই জড়ালে না। কেন বলতে পার ?

সুমিত্রা চুপ করে রইল।

অপূর্ব বললে, বোধ হয় বন্ধু বলে। অথবা কি জানি কেন, সেই শুধু জানে। তারও চেয়ে আশ্চর্য—স্ত্রী কি বললে জান ? বললে, হত্যা সেই করেছে, তার স্বামী নয় !

অপূর্ব সুমিত্রার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাইলে।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, স্বামী কি বললে ?

—বলেছে, সে নিজেই খুন করেছে। কিছুই গোপন না করে সমস্ত ঘটনা সে বলছে।

তুমি কোন্ পক্ষে ?

—স্বামীর পক্ষে।

—স্ত্রীর পক্ষে কেউ নেই ?

—আছেন একজন উকিল ?

—বেশ ভালো উকিল ?

—মন্দ নয়।

সুমিত্রা নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে বললে, আমার একটা অনুরোধ। স্ত্রীকেও বাঁচাবার চেষ্টা কোর। ওর যত অপরাধই থাক, স্বামীকে ও ভালোবাসে।

॥ চার ॥

মেয়েটির জন্যে সুমিত্রা খুব বিচলিত হল। কে মেয়েটি, কোথায় থাকে, কী তার নাম কিছুই জানা নেই? তবু তার চিন্তা মাথা থেকে কিছুতেই দূর করতে পারে না। বিশেষ একটি মেয়ে অকস্মাৎ নির্বিশেষে পৌঁছে গেল। তার নাম-ধাম মুছে গেল।

মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা সেই মেয়েটির কি হল গো?

অপূর্বর পসার এখন বেড়েছে। একটি মামলা নিয়ে তার কারবার নয়। কত মামলায় কত মেয়ে রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলে, কোন্ মেয়েটি?

—সেই যে গো, স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে খুনের দায় নিজের ঘাড়ে নিয়েছে।

ভ্রূ কুঁচকে অপূর্ব একটু ভাবতে মনে পড়ল। বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই জেল-হাজতে রয়েছে।

—মামলায় কি হবে মনে হয়? মেয়েটি কি ছাড়া পাবে?

সুমিত্রার সমস্ত চিন্তা মেয়েটির জন্যে।

অপূর্ব বললে, বলা যায় না। পেতে পারে।

—আচ্ছা, মেয়েটি সমস্ত দায় কিজন্যে নিজের ঘাড়ে নিলে বলে মনে হয়? সন্দেহ নেই, নিহত লোকটির সঙ্গে তার ভাব ছিল। ছিল না?

—নিশ্চয় ছিল।

—তাহলে তাকে যে মেরেছে তার উপর রাগ হওয়াই স্বাভাবিক।

—নিশ্চয়।

—অথচ তাকে বাঁচাবার জন্যে নিজে মরতে চলেছে।

অপূর্ব বললে, এ ধরণের মেয়ে এমন করে না। কেন করলে কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

সুমিত্রা বললে, এ ধরণের মেয়ে ও নয়। স্বামীকে ও ভালোবাসে।

—আর স্বামীর বন্ধুকে ?

—তাকেও। আর যখন সে মরেই গেল, আর ফিরবে না, তখন অন্যটিকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। নিজের জীবন দিয়েও।

অপূর্ব বললে, আর একটা দিকের কথাও ভাব। এমনও হতে পারে, ও বুঝেছে, যে কলঙ্ক ওর নামে রটবে এই মামলায়, তাতে ওর পক্ষে বেঁচে থাকা দুঃসহ। সেইজন্যে ও মরতে চলেছে।

মাথা নেড়ে সুমিত্রা বললে, না, তা নয়। মানুষ মরতে সহজে চায় না। বিশেষ এই বয়সে।

অপূর্ব বললে, বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু কেউ কেউ না চাইতেও তো পারে।

জেদের সঙ্গে মাথা নেড়ে সুমিত্রা বললে, চাইতে পারে। কিন্তু ও সে দলের নয়। ওর কথা সমানে ভাবছি, যত ভাবছি তত ওর সম্বন্ধে আমার বিস্ময় জাগছে। ওকে আমি ভুলতে পারছি না। বিশ্বাস কর, ও অন্য মেয়ে।

ওর বিশ্বাসের দৃঢ়তায় অপূর্ব অবাক হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুমিত্রা আবার বললে, ওকে তুমি বাঁচাও। বাঁচাবে বল ?

—চেষ্টা করব। কিন্তু আর একটা কথা জিগ্যেস করি।

বল।

—ধর, বিচারে ওরা দুজনেই ছাড়া পেয়ে গেল। বেরিয়ে এসে ওরা কি আর একসঙ্গে ঘর করতে পারবে ?

প্রশ্নটা শুনে সুমিত্রা চমকে উঠল। তার সমস্ত চিন্তা শুধু বর্তমানকে নিয়েই আবর্তিত হচ্ছিল। এই সবশেষের এবং সবচেয়ে বড় প্রশ্নের কথা তার মনেই আসেনি।

সে থমকে গেল।

অপূর্ব আবার প্রশ্ন করলে, বল। কী তোমার মনে হয়?

সুমিত্রা তখনই-তখনই জবাব দিতে পারলে না। একটু পরে বললে, পারাই তো উচিত। তুমি কি বল?

অপূর্ব বললে, আমি কিছু বলি না। যা উচিত তা যে সবসময় হয় তাও না। মানুষের মন সবসময় নীতিশাস্ত্রের পথ দিয়ে চলেও না। আমার কি মনে হয় জান?

—কি?

—মরলে মেয়েটি বোধ হয় বেঁচেই যাবে। এবং মেয়েটির নিজেরও তাই বিশ্বাস। মেয়েটি কিছুতেই তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে রাজী হচ্ছে না।

—তাই নাকি?

—তার উকিল তো তাই বলছে।

সুমিত্রা গুম হয়ে বসে রইল।

অপূর্ব ধীরে ধীরে ওর পিঠের উপর একখানি হাত রাখলে। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, মেয়েটির জন্যে আমারও দুঃখ হয়। ওকে বাঁচাবার জন্যে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব। কিন্তু সেটা ভালো হবে কি মন্দ হবে, তা তুমিও বলতে পারলে না আমিও জানিনে।

বিকেলে দক্ষিণের বারান্দায় একখানি বেতের চেয়ারে বসে সুমিত্রা বই পড়ছিল, রামধন এসে জানালে নিচে অনেক বাবু এবং দিদিমণি এসেছে।

অনেক যে, তাদের কলরবের প্রচণ্ডতা থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। সকালে অপূর্ব থাকে এবং তার মক্কেল আসে বলে এরা আর আসে না। সুমিত্রা নিষেধ করে দিয়েছে। সুতরাং এই ওদের আসার সময় এবং এই সময়েই এসেছে।

সুমিত্রা নিচে নেমে এল।

জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার। অত চ্যাঁচাচ্ছ কেন? দিগ্বিজয় করে এলে নাকি?

—দিগ্বিজয়ই বটে। আগে একটু চা খাওয়াও। কণ্ঠে মরুভূমির তৃষ্ণা। তারপরে আমরা চা খেতে খেতে তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমাদের সঙ্গে বেরুতে হবে।

—কোথায়?

সে যাবার পথে বলব। অত্যন্ত জরুরী। তুমি আর দেরি কোর না।

একটি মেয়ে গান ধরলে ঃ

"জানিনে তো ফিরব কিনা
কার সাথে আজ হবে চিনা।
ঘটে সেই অজানা বাজায় বীণা
তরণীতে।"

সুমিত্রা ধমক দিলে ঃ গান রাখ। ব্যাপারটা কি বল। যে ছেলেটি গীটার বাজায়, সে বললে, সমস্ত কথা হয়ে গেছে। আজ নিউ এম্পায়ারের স্টেজ ভাড়া নিতে হবে, ২৫শে বৈশাখের জন্য।

—রবীন্দ্রজন্মোৎসব?

—হ্যাঁ।

সুমিত্রা বললে, সেকি! সেদিন যে কথা হল এখন কিছুদিন আর কোনো ফাংশন হবে না!

—তখন রবীন্দ্রজন্মোৎসবের কথা ভাবিনি। দিকে দিকে রবীন্দ্রজন্মোৎসব হচ্ছে, আমরা চুপ করে থাকলে কি ভালো দেখাবে?

কথাটা ঠিক।

সুমিত্রা বললে, কিন্তু আমাকে কিছুই জানাওনি তো!

যে-মেয়েটি একটু আগে গান ধরে ছিল সে বললে ইচ্ছে

করেই জানাইনি। তোমার কি হয়েছে তুমিই জান, কিন্তু তোমাকে আমাদের ভালো ঠেকছে না।

সুমিত্রা হেসে ফেললে : কেন রে?

—হ্যাঁ। ভালো ঠেকছে না। তুমি যেন কী হয়ে যাচ্ছ। কিছুতে উৎসাহ নেই। ক্লাবে একবার না গেলে নয় তাই যাও। তাও কমিয়ে এনেছ। তোমার কি হল বল তো?

—প্রেমে পড়িছি।

—তাই নাকি! আমাদেরও সেই সন্দেহ হচ্ছিল। কোথায়? কোথায়?

চোখ মট্‌কে সুমিত্রা বললে সেটি বলছি না। তাহলে তোরা ভাঙিয়ে দিবি।

যে ছেলেটি বেহালা বাজায় সে এসে সুমিত্রার একান্ত সন্নিকটে দাঁড়াল।

একটা হাত প্রসারিত করে বললে, কে সেই ভাগ্যবান, যে তোমার কঠিন হৃদয় জয় করতে পারে? তার একখানা ফটো দাও, আমরা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দোব।

সুমিত্রা সভয়ে পিছিয়ে এল : কী সাংঘাতিক ছেলে! খবরের কাগজে ছাপা হবে? না।

একটি মেয়ে গেয়ে উঠল :

"সে আমার গোপন কথা
শুনে যাও সখী!"

তার গাল টিপে সুমিত্রা বললে, না। কেউ শুনতে পাবে না। শুধু শুনে রাখ, আমি প্রেমে পড়ে গেছি। দুর্দান্ত প্রেম।

গীটার-বাজানো ছেলেটি প্রশ্ন করলে, কিরকম প্রেম সুমিত্রাদি? লাবাণ্যর মতো?

—না।

—তবে কি বন্যের মতো? তাই আমাদের ওপর এত নিষ্ঠুর?

—না। তাও না। সে একটা নতুন রকম। তোমরা তা ভাবতেই পার না।

—দরকার নেই। শুধু আমাদের ওপর এই নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ কর এই প্রার্থনা। চেক-বইটা সঙ্গে নাও, নিউ এম্পায়ারের স্টেজ বুক কর,—নৃত্যে, গীতে, আনন্দে আমরা কবিগুরুর জন্মোৎসব সম্পন্ন করি। বিলম্ব কোর না। সময় হাতে বেশি নেই।

সুমিত্রাকে বেরুতে হল ওদের সঙ্গে।

সুমিত্রার ইচ্ছা ছিল অপূর্ব কোর্ট থেকে ফেরবার আগেই বাড়ী ফিরবে। কিন্তু সাতটার আগে আর ফিরতে পারলে না। এদের পাল্লায় পড়লেই এমনি হয়।

নিউ এম্পায়ারের কাজ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে থেকে যেতে হল ক্লাবে। ২৫শে বৈশাখের নির্ঘণ্ট-রচনায় সেইখানেই দেরি হয়ে গেল।

বাড়ি ফিরেই রামধনকে জিজ্ঞাসা করলে, বাবু ফেরেননি এখনও?

রামধন বললে, তিনি আপনার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে চা খেয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সুমিত্রার মনটা খচ খচ করতে লাগল। গত কিছুকাল অপূর্ব কাছারী থেকে ফিরলে দুজনে একসঙ্গে চা খেয়ে আসছে। আজ তার ব্যতিক্রম হল।

রামধন জিজ্ঞাসা করলে, চা আনব মা?

—না।

শাড়ি-ব্লাউস কাঁধে ফেলে সে বাথরুমে যাবে, ঠাকুর এসে দাঁড়াল।

—কি ?

রান্না কী হবে মা ?

সুমিত্রার চোখ কপালে উঠল : এখনও রান্না চড়াওনি ?

ঠাকুর হাত জোড় করে বললে, আপনি ছিলেন না, তাই অপেক্ষা করছিলাম।

—অপেক্ষা করছিলে ! এই সাতটা পর্যন্ত ? এর পরে কখন রান্না চড়বে, কখনই বা খাওয়া হবে ! জাননা, বাবু সাড়ে ন'টার মধ্যে খান।

ঠাকুর বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল।

তারও দোষ নেই। সুমিত্রার কড়া হুকুম, তাকে জিজ্ঞাসা করে রান্না চড়াবে। কী রান্না হবে তার নির্দেশ সে দেবে। এতদিন তাই হয়ে আসছে। সর্তানুযায়ী সুমিত্রা প্রত্যহ বাজার যাচ্ছে। রান্নার নির্দেশও দিচ্ছে।

আজ প্রথম তার ব্যতিক্রম হল।

নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সুমিত্রা সচেতন এবং সেইজন্যেই সে আরও ক্রুদ্ধ হয়েছে।

বললে, একটা দিন যদি না থাকি তাহলে সেদিন রান্না বন্ধ থাকবে ? বাড়ীসুদ্ধ লোক উপোস থাকবে ? একটুখানি নিজের বুদ্ধি খাটাতে পারবে না ?

সে বলতে পারত গিন্নিমার মৃত্যুর পর থেকে এপর্যন্ত সে নিজের বুদ্ধিই খাটিয়ে আসছিল। কোনদিন কাউকে উপবাসও করতে হয়নি। কিন্তু বেতনের বিনিময়ে বুদ্ধিটা যেদিন থেকে সে সুমিত্রার কাছে বন্ধক রেখেছে সেদিন থেকে আর নিজের বুদ্ধি খাটাবার জো নেই।

তার হয়েছে উভয় সঙ্কট। বুদ্ধি খাটালেও বিপদ, না খাটালেও বিপদ !

সুতরাং চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় কি ?

সুমিত্রা রেগে বললে, যাও। অমন করে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? যা পার রাঁধগে। আমাকে বিরক্ত কোর না।

ব'লে বাথরুমে চলে গেল।

ফিরে এসে, নিচে রান্নাঘরে দেখতে গেল ঠাকুর কি করছে।

ছাখে রান্নাঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

—ঠাকুর!

ভিতর থেকে উত্তর এল, যাই মা।

—তুমি দরজা বন্ধ করে কি করছ?

ভিতর থেকেই উত্তর এল, আজ্ঞে, উনোন ধরাচ্ছি।

বলতে বলতে ঠাকুর দরজা খুলে বেরিয়ে এল। মুক্ত দ্বারপথে এক ঝলক ধোঁয়া হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল। তার পিছু-পিছু ঠাকুর।

তার রক্তবর্ণ চোখ থেকে দরদর ধারে অশ্রু গড়াচ্ছে। সে যেন উপকথার রাজপুত্রের মতো গুহার মধ্যে একটা দুর্ধর্ষ দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে ফিরছে। হাতে পাখা। সমস্ত দেহ ঘর্মাক্ত।

বিস্মিত সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এতক্ষণে উনোন ধরাচ্ছ?

মুখের অবস্থা যাই হোক, ধূম্রদৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ-ফেরত ঠাকুরের মন বিজয়গর্বে উল্লসিত।

হাতের পাখাটা উঁচিয়ে বললে, আর ধরে এসেছে মা।

তারপর একগাল হেসে বললে, তাড়াতাড়ি উনোন ধরাবার জন্মে হাওয়া করছিলাম।

ওর মুখ-চোখের অবস্থা আর কাণ্ডকারখানা দেখে সুমিত্রা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। চেয়ে দেখলে হাওয়ার চোটে উনোন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

পুলকিত কণ্ঠে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলে, কি রান্না হবে মা?

—যা হয় কর।

ব'লে সুমিত্রা চলে গেল।

ক্ষোভে দুঃখে ঠাকুরের বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। হায় চাকুরী! কিছুতে মনিবের মন পাবার উপায় নেই।

॥ পাঁচ ॥

একজন মাতালকে জানতাম, সে প্রতিজ্ঞা করে একটি বৎসর মদ স্পর্শ করেনি। তারপর সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে যখন আবার মদ ধরলে তখন সেই এক বৎসরের ক্ষতি ষোল আনার উপর আঠারো আনা পুষিয়ে নিলে।

সুমিত্রারও তাই হয়েছে।

বিগত দুটো বৎসর সে সংসারকর্মেই মনোনিবেশ করেছিল। ক্লাব একেবারে না ছাড়লেও প্রায় ছেড়ে দেওয়ার মতোই অবস্থা হয়েছিল। ক্লাবের ছেলেমেয়েরা এলে তাদের আবশ্যকীয় অর্থ এবং পরামর্শ দিত, ওই পর্যন্ত।

কিন্তু ওটা ছিল তার স্বভাবের বিরুদ্ধে। ঘরের মধ্যে বসে থাকা তার স্বভাব নয়, উড়ে বেড়ানই স্বভাব। নৃত্য গীত অভিনয় তার পেশা নয়—নেশা।

নেশা ছেড়ে যখন কেউ ধরে তখন দ্বিগুণ জোরে ধরে। তখন একেবারে তলিয়ে ভেসে যায়।

অপূর্ব এত খবর রাখত না। রাখবার অবসরও নেই। সে জানত সুমিত্রা সর্তানুযায়ী গৃহকর্মই করছে। সকালে কোর্টে যাবার আগে খাবার সময় কিংবা কোর্টের থেকে ফিরে চা-পানের সময় প্রথম প্রথম তাকে দেখতে না পেলে ভাবত কোথাও কোনো কাজে ব্যস্ত আছে বোধ হয়।

যখন শুনত সকালেই সে বেরিয়ে গেছে কিংবা কোর্ট থেকে

ফিরে খবর পেল দুপুরে সে বেরিয়ে গেছে—এখনও ফেরেনি, ভাবত সংসারের কোনো কাজেই হয়তো বাইরে গেছে।

এ নিয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ বা কৌতূহল জাগেনি। বিশেষ সুমিত্রার দলবলের আসা-যাওয়া একদিনও তার চোখে পড়েনি। পড়ার কথাও নয়। সে দশটার আগেই কোর্টে বেরিয়ে যায়, ফেরে পাঁচটায়।

কিন্তু ক্রমাগত সুমিত্রার অনুপস্থিতিতে একদিন অপূর্ব রামধনকে জিজ্ঞাসা করলে, তোর মা কোথায় রে?

—তিনি তো বাইরে গেছেন।

—বাজার থেকে কখন ফিরলেন?

—বাজার! তিনি তো আর বাজার যাবার সময় পান না।

অপূর্ব অবাক হলঃ তাই নাকি! কতদিন থেকে সময় পাচ্ছেন না?

—অনেকদিন থেকেই বাবু।

অপূর্ব আর কিছু বললে না। বুঝলে এ দু'দিন সংসার নিয়ে যা সুমিত্রা করলে সে একটা সাময়িক বিলাস মাত্র। আবার সে তার পুরাতন স্বভাবের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে।

সে কোর্টে বেরিয়ে গেল।

সুমিত্রা সেই সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল, ফিরল বিকেল চারটেয়। রুক্ষ কেশ, রুক্ষ বেশ, শুষ্ক মুখ।

তার ফাংশনের দিন আর দূরে নয়। এর মধ্যে অনেক কাজ। দৃশ্যপট তৈরী করতে হবে, সজ্জার ব্যবস্থা করতে হবে। সে সঙ্গে রিহার্সাল চলছে পুরোদমে।

সমস্ত ভারই সুমিত্রার।

বেচারার সমস্ত দিন ছুটোছুটি করে কেটেছে। না হয়েছে স্নান, না আহার। কয়েক পেয়ালা চা আর টোস্ট-ডিমের উপর দিনটা কেটেছে।

ফিরে এসে স্নান করে একটু সুস্থ হল।

রামধন জিজ্ঞাসা করলে, আপনার চা আনি, মা।

—এখন থাক্। বাবু এলে একসঙ্গে হবে। যদি একটু সরবত খাওয়াতে পারিস তো ছ্যাখ্।

একটু পরেই অপূর্ব এল।

সামনে সদ্যস্নাতা এবং সদ্যপ্রসাধিতা সুমিত্রাকে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বললে, বাঃ! চমৎকার দেখাচ্ছে।

সুমিত্রা লজ্জা পেল: যাও। বাজে বোক না।

অপূর্ব বললে, বোধ হয় অনেকদিন পরে দেখছি বলেই এত সুন্দর দেখাচ্ছে।

ব'লেই আর দাঁড়াল না। খোঁচাটা পরিপাক করবার জন্যে সুমিত্রাকে সময় দিতে পোশাক ছাড়বার জন্যে ঘরে গেল। সেখান থেকে বাথরুমে। সেখান থেকে ফিরে এসে সুমিত্রার পাশে একটা চেয়ারে বসল।

চাকর উভয়ের চা-খাবার দিয়ে গেল।

অপূর্ব বললে, মেয়েদের রূপ বস্তুটা যে কী, এর আর মীমাংসা হল না।

সুমিত্রা হেসে বললে, তাতে তোমাদের অসুবিধাটা কি হল? মেয়েদের মধ্যে তোমরা কি রূপ ছাড়া আর কিছুই খোঁজ না?

—কি জানি কি খুঁজি!

অপূর্ব চায়ে চুমুক দিলে। তারপর বললে, কিন্তু এটা ঠিক যে মেয়েদের যে বস্তু পুরুষকে সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশি করে আকর্ষণ করে সে হচ্ছে তাদের রূপ। এই রূপ পুরুষের চোখে নেশা লাগায় এবং সবচেয়ে আশ্চর্য, সেই নেশা মেয়েদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। তাদেরও চোখে ঘোর লাগায়।

—তার পরে?

—তারপরে বিশ্বভুবন চড়কে ঘুরিয়া হল বিভোল'। শুধু ঘুরপাকের খেলা।

অপূর্ব হাসলে। বললে, কিন্তু একটা কথা ভাবি, এই রূপটা কোথায়? মেয়েদের দেহে না পুরুষের চোখে?

সুমিত্রা বললে কোথাও না। কবি বলেছেন:

"নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন।"

অপূর্ব বললে, ঠিক। কিন্তু তার মনে নীলিমা আছে, কিন্তু তাকে ছেঁকে পাওয়া যায় না।

সুমিত্রা তৎক্ষণাৎ বললে, তার মনে নীলিমা আছে শুধু দূরত্ব আছে বলে। নইলে নেই।

—তাহলে বলতে হয়, রূপ দূরত্বের মধ্যে?

—বলতে পার।

একটু ভেবে অপূর্ব বললে, রূপ অন্যতার মধ্যেও।

—সেটা কি?

—আমি যা নই তার মধ্যে। যার জন্যে পুরুষের রূপ পুরুষকে আকর্ষণ করে না। কিম্বা মেয়েদের রূপ মেয়েকে আকর্ষণ করে না, মানে ঘুরপাক খাওয়ায় না।

সুমিত্রা হেসে বললে, তোমার আজ হল কি বল তো? কোর্ট থেকে মক্কেল ঠেঙিয়ে এসে হঠাৎ রূপতত্ত্ব নিয়ে পড়লে কেন?

—পড়লাম কেন বলি।

অপূর্ব বলতে লাগল:

কথাটা কোর্ট থেকেই মনকে দোলা দিচ্ছিল। তারপরে যদিই-বা ভুলে যেতাম, ফিরে এসেই দেখলাম তোমাকে। তখন আবার নতুন করে দোলা দিল।

একটি মেয়েকে নিয়ে মামলা।

সুমিত্রা হেসে বললে, যত মামলা কি মেয়ে নিয়ে?

—অন্তত ফৌজদারী কোর্টের বারো আনা মামলা।

অপূর্ব একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বলতে লাগল :

মেয়েটি রূপবতী নয়। রং কালো। লম্বা লিকলিকে পুরুষালি গড়ন। সিনেমায় অভিনয় করে। বাপ মা আছে। কিন্তু সেখানে থাকে না। একটা ফ্লাট ভাড়া নিয়ে অন্যত্র থাকে।

তার দুটি নায়ক। দুজনেই বিশিষ্ট বংশের ছেলে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একদিন সংঘর্ষ বেধে গেল। একজন আর একজনকে গুলী করলে। গুলী লাগল হাতে। হাতটা কেটে ফেলে দিতে হয়েছে। এই নিয়ে মামলা।

সবচেয়ে আশ্চর্য কি জান, মামলা তদ্বিরের জন্যে দুজনেরই স্ত্রী কোর্টে এসেছিলেন আজ। দুজনেই আশ্চর্য সুন্দরী। তাঁদের ছেড়ে দুটি স্বামীই ওই কালো মেয়েটিকে নিয়ে মাতাল! তার জন্যে খুনোখুনি করতে প্রস্তুত।

কি বলব একে?

একটুক্ষণ ভেবে সুমিত্রা বললে প্রবৃত্তি।

—প্রবৃত্তি। তাই হবে। তাহলে ছাখো, রূপের আকর্ষণ প্রবৃত্তির ওপরও নির্ভর করে।

—করেই তো।

—আমি একেই বলছিলাম, নারীর রূপ পুরুষের চোখে কোথায় কার মন বাঁধা পড়ে কেউ বলতে পারে না।

সুমিত্রা নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

সে যেন কি ভাবছিল। যৌবনের উন্মেষ থেকে আজ পর্যন্ত অনেক কথা। সব শেষে প্রমথর কথা।

প্রমথ ওদের দলে সেতার বাজায়। লম্বা, লিকলিকে চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। পোশাক পরে অদ্ভুত : লম্বা ঢিলে পাঞ্জাবি কিন্তু আমেরিকান কাফ। ধুতি মাড়োয়ারী ঢঙে কিন্তু ঢিলে

ছাঁদে পরা। পায়ে কাবুলী স্যাণ্ডাল। দুই হাতের আঙুলে গোটা পাঁচেক আংটি। চলে লম্বা লম্বা পা ফেলে।

ওকে সুমিত্রার ভালো লাগে।

রূপ কিছুই নেই। অপূর্বর কাছে দাঁড়ালে দাঁড়কাক বলে মনে হবে। তবু ভালো লাগে। ছেলেটির প্রাণশক্তি প্রচুর,—উদ্দাম, অফুরন্ত বেগবান। আর আছে চশমার আড়ালে দুটি স্বপ্নালু চোখ।

ওকে সুমিত্রা প্রশ্রয় দেয়—যে-প্রশ্রয় ওর চেয়ে অনেক সুন্দর ছেলে পায় না।

কেন?

সুমিত্রা ভাবছিল। তার অতীত দীর্ঘ নয়। এই স্বল্প-কালের জীবনের অনেক কথা ছায়াছবির মতো তার চোখের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে মন্থর স্রোতে প্রবাহিত হয়ে গেল।

যে কথা কোনদিন তার অদ্ভুত মনে হয়নি, আশ্চর্য বোধ হয়নি,—অনেক কথা যার কিছু সে ভুলেই গিয়েছিল, কিছু ভুলে না গেলেও স্মৃতির অনেক নিচে পড়েছিল,—সেগুলি একে একে স্মৃতির উপরতলায় উঠতে লাগল।

অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা অসাধারণ হয়ে ফুটে উঠল। তুচ্ছ বিশেষ হয়ে। যে ঘটনাকে কখনই সে গুরুত্ব আরোপ করেনি, যা সে মনে রাখার যোগ্য বলেই মনে করেনি, তাদের উপর কে যেন রং মাখিয়ে দিয়েছে।

অপূর্ব কখন উঠে খোলা ছাদে চলে গেছে খেয়ালই করেনি।

ঠাকুর এসে জিজ্ঞসা করলে, কি রান্না হবে মা?

—যা খুশি।

অপূর্ব একটু পরে ছাদ থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, সিনেমায় যাবে?

—না।

—কি ভাবছ ?

—কিছু ভাবিনি তো ?

সুমিত্রা অন্য দিকে মুখ ফেরালে

পর পর তিনদিন ছুটি ।

অপূর্বের কোর্ট ছিল না। মক্কেলের ভিড়ও ছিল না। অনেকদিন পরে অনেকদিনের ধূলো ঝেড়ে একখানি উপন্যাস নিয়ে বসল।

কতদিন পরে উপন্যাস খুলল !

কয়েকটা পাতা পড়েছে এমন সময়ে সিঁড়িতে হাই-হিল জুতোর শব্দে অপূর্ব উচ্চকিত হল।

সে-ভাবটা কাটবার আগেই রঙিন শাড়ির আঁচল উড়িয়ে ঝড়ের বেগে সুমিত্রা ঘরে ঢুকল।

—তুমি কি কোথাও বেরুবে ?

থতমত খেয়ে অপূর্ব বললে, না।

—তাহলে গাড়িখানা আমি নিয়ে চললাম।

—আচ্ছা।

সুমিত্রা যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল।

অপূর্ব মুহূর্ত কয়েক ওর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে থেকে আবার বইতে মন দিলে।

কিন্তু অনেকদিনের অনভ্যাসের জন্যে কিনা জানি না, পড়ায় তেমন মন বসে না। রসের গভীরে মন ডুব দিতে পারছে না। একটু ডুবেই ভেসে উঠছে। পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হচ্ছে।

একবার মনে হল কোথাও আড্ডা দিতে বেরিয়ে পড়ে। ছুটির দিনে ক'টি বন্ধুর বাড়ি আড্ডা বসে। বেশ জমাটি আড্ডা। তার কোনো একটিতে যাওয়া যেতে পারে। কাছাকাছি কোনো একটিতে।

তাও কেমন আলস্য বোধ হোল। তার উপর গাড়ি নেই। সুমিত্রা নিয়ে চলে গেল।

ভালো কথা, সুমিত্রা কোথায় গেল?

কে জানে কোথায় গেল। হয়তো কোনো আত্মীয় কি বন্ধুর বাড়ি। কিম্বা ওদের সেই ক্লাবে। সেখানে অনেক তরুণ-তরুণী গান বাজনার নামে চব্বিশ ঘণ্টা হুল্লোড় করছে!

ওদের কি কোন কাজ নেই?

অথবা অন্নচিন্তা?

সুমিত্রার পিছনে ওরা ঘোরে কেন?

কিন্তু সুমিত্রাই যে ওদের আকর্ষণ করে তা তো নয়, ওরাও সুমিত্রাকে আকর্ষণ করে। যার জন্যে ঘরে সুমিত্রার মন বসে না। কেবলই উড়ে বেড়ায়।

অপূর্ব এখন ব্যস্ত মানুষ। বাড়ির মধ্যে কতক্ষণই বা থাকতে পায়? আজ ছুটির দিন। দুজনেই দুজনকে পরিপূর্ণ করে পেতে পারত। কত কাজের কথায়, কত বাজে কথায় আজকের মুহূর্তগুলি ভরে তুলতে পারত।

সে-কথা সে ভাবলেই না।

পর পর তিনদিন ছুটি। এমনি করে একা একা তিনটে দিন সে কাটাবে কি করে?

তার একটি বন্ধু গেল পুরী। তাকেও যাবার জন্যে সাধাসাধি করেছিল।

গেল না। কী বোকামিই না করেছে। আজ সন্ধ্যার পুরী-এক্সপ্রেসে চলে যাবে পুরী? এখানে কি কাজ? এই শূন্য ঘরে একা থাকার চেয়ে সে কি:ভালো হবে না?

অপূর্বের মন উসখুস করতে লাগল।

দেখতে দেখেত এগারোটা বাজল। বারোটা। ছুটির দিনে খেতে একটু দেরিই হয়। বারোটায় সে খেয়ে নিলে।

তারপরে বিছানায় একটু গা গড়াতে যাবে, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল।

—হ্যালো!

—শোন—আমি সুমিত্রা। একটু বিশেষ কাজে আট্‌কে গেছি। খুব জরুরি কাজ। গাড়িখানাও আট্‌কে রেখেছি। কিছু অসুবিধা হবে না তো?

—না। শোবার সময় আর গাড়ির কি দরকার?

—ও। তোমার খাওয়া হয়ে গেছে?

—এই হল।

—আমার ফিরতে একটু রাত হবে। সাড়ে ন'টা-দশটা। কিছু মনে কোর না। অ্যাঁ?

—না, মনে করবার কি আছে?

—আচ্ছা।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে দিলে।

বিছানায় শুয়ে অপূর্ব অনেকক্ষণ ছটফট করলে। তার বুকের ভিতরে কেমন একটা যন্ত্রণা হচ্ছে না? না, বুকের ভিতর নয়, যেন মস্তিষ্কে।

কিছুক্ষণ ছটফট করে রামধনকে ডাকলে।

বললে, আমার জন্যে একটা বিছানা বাঁধ্। আর একটা স্যুটকেসে দু'দিনের মতো জামা-কাপড়, সাবান-তোয়ালে, আর যা যা বাইরে যাবার সময় দরকার হয়, গুছিয়ে রাখ্। এখনই।

রামধন অবাক হয়ে অপূর্বর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—বোকার মতো দেখছিস কি? বুঝতে পারলিনে আমার কথা?

—বাবু কি বাইরে যাবেন?

—হ্যাঁ। বুঝতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

বুঝতে তথাপি রামধনের দেরি হল। কোথাও কিছু নেই,

একটা টেলিফোন এল আর হঠাৎ বাক্স-বিছানা বাঁধবার ধুম পড়ে গেল!

জিজ্ঞাসা করলে, মা-ঠাকরুন শুদ্ধ যাবেন?

অপূর্ব বারুদের মতো ফেটে পড়ল: ওরে হতভাগা, না! শুধু আমার বিছানা, আমার স্যুটকেস গোছাতে বললাম। তার চেয়ে বেশি বুদ্ধি তোকে প্রকাশ করতে হবে না।

ধমক খেয়ে রামধন চলে যাচ্ছিল।

অপূর্ব ডেকে বললে, আর ঠাকুরকে বলবি সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে আমাকে যা-হয়-হুটি যেন খাইয়ে দেয়। বুঝলি?

রামধন ঘাড় নেড়ে চলে গেল। কিন্তু বিশেষ বুঝলে বলে মনে হল না।

সে রান্নাঘরে গিয়ে ঠাকুরকে খবরটা দিলে। তারপর বিজ্ঞের মতো জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা কি বল দেখি।

—কিসের?

—বাইরে যাওয়ার।

ঠাকুর হাসলে: কেন, লোকে কি বাইরে যায় না?

—আহা, তা নয়। তুমি ব্যাপারটা বোঝ না কেন? বাইরে যাবেন, সে তো সকালেই বলতে পারতেন। কোথাও কিছু নেই, একটা টেলিফোন এল আর বললেন, বাক্স বিছানা বাঁধ্! কেমন-কেমন ঠেকছে না?

নিস্পৃহভাবে ঠাকুর বললে, কেমন কেমন আবার কি? হয়তো ওই টেলিফোনেই হুকুম এল কোথাও যাবার। হাকিমের হুকুম হলেই উকিলবাবুদের যেতে হবে। এ তো জানা কথা। বলে, হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরে না। উকিলের বাড়ি কাজ করছিস এতকাল, আর এ জানিস না।

এ কথাটা রামধনের মনে লাগল। মনে মনে ঠাকুরের বুদ্ধির তারিফ করলে। মন থেকে দুশ্চিন্তা অনেকখানি চলে গেল বটে,

কিন্তু সম্পূর্ণ গেল না। কোথায় একটা অজ্ঞাত কাঁটা যেন থেকে থেকে খচ-খচ করে বিঁধতে লাগল।

॥ ছয় ॥

সুমিত্রার ফিরতে দশটা হল।

বারান্দা থেকেই উঁকি দিয়ে দেখলে খাটে অপূর্ব শুয়ে নেই। আর একবার ভালো করে উঁকি দিলে। না, সত্যিই ঘরে অপূর্ব নেই।

নিশ্চয় খোলা ছাদের বাগানে বসে আছে। অনেক দিন যখন ঘুম আসে না, কিম্বা সুমিত্রার জন্যে অপেক্ষা করে তখন অপূর্ব বাগানে একখানা ডেক-চেয়ারে চুপ করে শুয়ে থাকে। রাত্রে খোলা আকাশের নিচে নিঝুম বসে থাকতে বরাবরই অপূর্বের খুব ভালো লাগে।

সুমিত্রা জানে।

কিন্তু অপূর্বকে পরে খুঁজবে। তার আগে স্নানটা সেরে নেওয়া দরকার।

সুমিত্রা স্নানের জন্যে তৈরি হবে এমন সময় রামধন এসে খবর দিলে, বাবু সাতটার পর বাইরে গেছেন। সে নিজে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছে।

—কোথায় গেছেন?

—তা জানিনে।

—তা কিছু বলে যাননি?

—না।

তাহলে হয়তো কোনো চিঠি রেখে গেছে। সুমিত্রা সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজলে, কোথাও একটি লাইন কোনো লেখা পাওয়া গেল না।

কী আশ্চর্য! কোথাও যাবার তো তার কথা ছিল না। দুপুরেই তো তাকে সুমিত্রা ফোন করেছে। কোথাও যাবার কথা থাকলে নিশ্চয়ই তখন বলত।

সুমিত্রা আবার রামধনকে ডাকলে।

জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ চলে গেলেন যে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দুপুরে একটা টেলিফোন এল। শোবার ঘরে এসে আমাকে হুকুম দিলেন বাক্স এবং বিছানা গুছিয়ে রাখতে। সাতটার মধ্যে কিছু খাইয়ে দিতে। সাতটায় খেয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকতে বললেন। আমাকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে গেলেন। টিকিট কেটে গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরে গাড়ি ছেড়ে দিল।

—কে টেলিফোন করেছিল জানিস?

—ঠাকুর বলছে, হাকিম।

—হাকিম? ঠাকুর কি করে জানলে?

—কেউ কিচ্ছু জানে না, মা। কাকেও কিচ্ছু বলেও যাননি। কিন্তু ঠাকুর বলছে, হাকিম ছাড়া আর কার হুকুমে বাবু তড়িঘড়ি চলে যাবেন!

—ঠাকুরের খুব বুদ্ধি! আচ্ছা, যা তুই।

গা-ধোয়া রইল। বারান্দায় একখানা চেয়ারে সুমিত্রা ধপ করে বসে পড়ল।

এমন তো কখনও হয় না। কোনো জরুরী প্রয়োজনে হঠাৎ যদি অপূর্বর কোথাও যাবার দরকারই পড়ে থাকে, একখানা চিঠি লিখেও নিশ্চয় তাকে জানিয়ে যেতে পারত। সময়ের এত অভাব নিশ্চয়ই ছিল না।

কি ব্যাপার ?

রাগ ?

কিন্তু অপূর্ব তো তেমন নয় ! সে অত্যন্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতির মানুষ। সুমিত্রা অপূর্বকে রাগতে কখনও দেখেনি। শান্ত, স্বল্পবাক লোকটির মুখে সকল সময়ই প্রসন্ন হাসির রেখা।

আর রাগেরই বা কি হয়েছে ?

কি হতে পারে, সুমিত্রা কিছুই ভেবে পেলে না।

অপূর্ব দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়। অনেক মামলার দায়িত্ব তার মাথার উপর। নিরুদ্দেশ হবার লোক সে নয়।

কিন্তু জানিয়ে গেল না কেন ? সুমিত্রাকে জানিয়ে যাবার কি কোনো আবশ্যক ছিল না ?

এইটেই পীড়া দিতে লাগল।

রাত্রে সুমিত্রা সংকল্প করে শুয়েছিল, অনেকদিন বাজার যায়নি, সকালে উঠে বাজারে যাবে। কিছু গৃহকর্ম-ও করবে। তারপরে অন্যান্য যে কাজ আছে হবে।

কেন এ সংকল্প তার মাথায় এসেছিল সেই জানে। হয়তো অপূর্বর এইভাবে খবর না দিয়ে চলে যাওয়াটা সে তার উপর রাগ করে চলে যাওয়া বলেই ভেবেছিল। কি হয়তো এমনি একটা খেয়াল।

কিন্তু সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন আটটা।

অভ্যাসবশে একবার পাশের খাটের দিকে চাইলে। শয্যা শূন্য। একবার জানালার বাইরে চাইলে। সামনের বাড়ির দেয়ালে প্রচুর রোদ পড়েছে।

অলসভাবে সুমিত্রা পাশ ফিরে শুল।

একটু পরে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে এল। চা খেলে। কিন্তু বাজার যাওয়ার কথা ভাবতেও বিশ্রী লাগল। বন্ধু-বান্ধবকে গোটাকয়েক ফোন করলে এবং তারপর গাড়ি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ফিরল অন্যদিনের চেয়ে একটু সকালে—একটায়। ফিরেই জিজ্ঞাসা করল, কোনো টেলিগ্রাম আসেনি ?

কার টেলিগ্রাম সে প্রত্যাশা করে ? অপূর্বর ?

না। কোনো টেলিগ্রাম আসেনি। ক'খানা চিঠি এসেছে।

কিন্তু চিঠি আসার কথা নয়। এত তাড়াতাড়ি চিঠি আসতে পারে না। সেগুলো সে স্পর্শও করলে না। স্নান করতে চলে গেল। তারপর অকারণে এ-ঘর ও-ঘর ঘোরাঘুরি করলে কিছুক্ষণ। কি যেন খোঁজাখুঁজি করলে।

তারপর বেরিয়ে চলে গেল।

মনের মধ্যে সুমিত্রা যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু কিসের জন্যে অস্বস্তি বুঝতে পারছে না।

ওর অবস্থা হয়েছে মাতালের মতো। যখন দুঃখ আসে, সেই দুঃখ লঘু করবার জন্যে তার মদ্যপানের প্রয়োজন হয়। আবার যখন আনন্দ আসে, সেই আনন্দ পরিপূর্ণ উপভোগের জন্যেও মদ্য-পানের প্রয়োজন।

সুমিত্রার মদ্য তার ক্লাবের আড্ডা।

সেইখানে নেচে, গান গেয়ে, অকারণে উল্লাস করে রাত্রি ন'টার মধ্যে নিজেকে ক্লান্ত করে ফেললে।

বললে, এইবার বাড়ি যাব।

—সেকি ! এর মধ্যে ?

—এর মধ্যে কি ? ন'টা বাজে। খেয়াল রাখ ?

—কিন্তু চিত্রাঙ্গদার শেষের নাচটারই তো রিহার্সাল দেওয়া হল না—যেটা আসল।

সুমিত্রা বললে, আসল-নকল বুঝি না। আর পারছি না, শরীর ভেঙে আসছে।

সবাই বললে, শরীর ভেঙে আসছে বললে শুনছি না। ওই নাচটার রিহার্সালের পর ছুটি।

—কিন্তু আর পারছিনে যে।

—পারতেই হবে।

সুমিত্রাকে নাচতে হল, সেই নাচটা। বৎসর শেষ হয়ে উঠল। চিত্রাঙ্গদার রূপের আলো স্তিমিত হয়ে আসবার ক্ষণ আসন্ন। যা দিয়ে অর্জুনকে সে বেঁধেছিল নারী-জীবনের সেই নাগপাশ শিথিল হয়ে আসে।

বাঁধন খুলে যাবার আগে শেষ নৃত্য চিত্রাঙ্গদাকে নাচতে হবে। সুমিত্রা উঠে দাঁড়াল।

ক্লান্ত পায়ে সেই অক্লান্ত নৃত্য আরম্ভ হল।

পাণ্ডুর হয়ে আসে কপোলের রক্তিম আভা, ওষ্ঠের লাস্য। রুক্ষ হয়ে আসে ললাটের মসৃণতা। লীলায়িত বাহুতে ধীরে ধীরে ফুটতে থাকে আবার কিণাঙ্ক-রেখা। চোখের দীপ্তি ম্লান হয়ে আসে।

শেষ নৃত্য চিত্রাঙ্গদা নাচলে। অপূর্ব সে নাচ।

তখন ক'টা বাজে কে জানে! বিছানায় শুয়ে শুয়েই সুমিত্রা অনুভব করতে লাগল বাড়িতে যেন একটা চঞ্চলতা এসেছে। দাসী-চাকর মহলে একটা ব্যস্ততা।

অনুমান করলে, অপূর্ব ফিরেছে বোধ হয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে। কিন্তু অপূর্বর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে না।

তবে সে নয় বোধ হয়। তবে অন্য-কিছু, অন্য-কেউ।

সুমিত্রা কালকের রাত্রির ক্লান্তি কাটাবার জন্যে আর একবার পার্শ্ব-পরিবর্তন করলে। অপেক্ষা করতে লাগল, যদি অপূর্ব হয়, এখনি তার ঘরে আসবে।

একটু তন্দ্রা এসেছিল বোধ হয়।

কি হয়তো আসেনি।

যখন উঠল, জানালা দিয়ে দেখলে পাশের বাড়ির দেয়াল রোদে ঝলমল করছে।

বাইরে এসে দেখলে বারান্দার কোণে একটা বিছানা আর স্যুটকেস ঠেস দিয়ে রাখা।

রামধন বলল, বাবু এসেছেন।

অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড অভিমান সুমিত্রার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে দিলে। কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে সে নিজের কাজে চলে গেল।

ফিরে আসতে, রামধন চা এনে দিলে।

এতক্ষণে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, বাবুকে চা দিয়েছিস ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় তিনি ?

—আপিস-ঘরে।

সুমিত্রা আর কিছু বললে না। চুপ করে বসে রইল।

স্থির করলে, অপূর্বর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সে নিচে যাবে না। সকালের রিহার্সালেও যাবে না। এইখানেই অপেক্ষা করবে। এরকম ব্যবহার অপূর্বর কাছে সে কখনও পায়নি।

তার অভিমান হয়েছে।

সে ঘরের জিনিসপত্র গোছাতে লাগল।

অনেকদিন এদিকে মন দেয়নি। সব অগোছালো, বিশৃঙ্খল।

সেলফের বইগুলোতে ধূলো জমেছে। সেগুলো ঝেড়ে আবার নতুন করে সাজিয়ে রাখল। টিপয়ের উপর একরাশ বাজে জিনিসের জঞ্জাল। সেগুলো ফেলে দিলে।

লাইব্রেরী-ঘরের আলমারীর কোণে মাকড়সার জাল। কাচগুলো কতদিন মোছা হয়নি কে জানে। মেঝের কার্পেটের উপর কী যে নেই তার ঠিক নেই। ওলটানো অ্যাশ-ট্রে'টা এক জায়গায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ছাই আর সিগারেটের টুকরো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

সুমিত্রাকে ঝাঁটা হাতে করতে দেখে রামধন ছুটে এল।

সুমিত্রা ধমক দিলেঃ থাক্। আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না। তোদের দৌড় বোঝা গেছে।

বোকার মতো রামধন দাঁড়িয়ে।

সুমিত্রা আবার ধমক দিলেঃ যা, নিজের কাজে যা। বাবুর কাছারী যাবার সময় হল।

রামধন বললে, বাবু তো কখন কোর্টে চলে গেছেন, মা!

সুমিত্রার হাত থেকে ঝাঁটাটা স্খলিত হয়ে পড়ে গেলঃ সেকি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাঁর খাওয়া হয়ে গেছে।

—অনেকক্ষণ।

কি আশ্চর্য!

সুমিত্রা বললে, আমাকে ডাকলিনে কেন?

—ডাকতে যাচ্ছিনু, মা। বাবুই নিষেধ করলেন। বললেন, উনি ঘুমোচ্ছেন। ডাকতে হবে না।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে সুমিত্রা বললে, বললিনে কেন, আমি ঘুমোইনি?

রামধন বললে, বল্লুম বইকি, মা। বাবু তবু বললেন, থাক্ বলে গেলেন, ফিরতে একটু দেরী হতে পারে।

সুমিত্রা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কী সাংঘাতিক!

একটা লোক যাবার সময় বলে গেল না। ক'দিন পরে ফিরে এল, একটা সম্ভাষণ দূরে থাক্, জানে আমি ঘুম থেকে উঠেছি তবু খাবার সময় ডাকতে দিলে না!

এর মানে কি?

অপূর্ব কি সুমিত্রাকে অপমান করতে চায়?

কেন?

সুমিত্রার চোখ ফেটে জল আসবার মতো হল। কিন্তু তারপরে ধীরে ধীরে তার চোখ জ্বালা করতে লাগল। নাসারন্ধ্র স্ফূরিত হল।

সে উঠল।

রামধনকে ডেকে বললে, দুপুরে সে ফিরবে না। রাত্রেও ফিরতে দেরি হতে পারে।

—আপনার খাবার কি ঘরে রাখব মা?

—দরকার হবে না।

সুমিত্রা সেজেগুজে বেরিয়ে চলে গেল।

॥ সাত ॥

সুমিত্রার সঙ্গে অপূর্বর দেখা হয়না বললেই চলে।

অপূর্ব ভোরে ওঠে। উঠে নিচের অফিস-ঘরে চলে যায়। মক্কেল কোনোদিন আসে, কোনোদিন আসে না। কিন্তু মামলার কাজকর্ম থাকে।

সুমিত্রা আটটায় ওঠে। উঠে বেরিয়ে চলে যায়। সাড়ে ন'টায় অপূর্ব যখন স্নানাহার করে তখন সে বাইরে। আবার দুপুরে যখন কোর্ট থেকে ফেরে তখন সুমিত্রা বাইরে। ফেরে যখন রাত্রে: অপূর্ব খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কেউ কারও কথা জিজ্ঞাসা করে না।

কলহও হয় না।

তবু জিনিসটা ঠাকুর-চাকরের দৃষ্টি এড়ায় না। তারা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে গোপনে আলোচনাও করে।

—কি ব্যাপারটা বল্‌তো রামধন? তুই তো বাবুর পেয়ারের চাকর।

—কি জানি ঠাকুরমশাই। ব্যাপার যে কি, কিছুই বুঝি না। কিন্তু ভালো নয়।

—তা তো বুঝছি। কর্তা-গিন্নিতে কথা নেই।

—আবার ঝগড়াও নেই।

—না বড়লোকের বাড়ির কাণ্ডই আলাদা।

রামধন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, তা তো বটে ঠাকুর; কিন্তু লক্ষ্য করেছ, বাবুর মুখে হাসিটি নেই। সব সময় একটা থমথমে ভাব।

হ্যাঁ। আর চেহারাও যেন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

—লক্ষ্য করেছেন? ওইটেই ভয়ের কথা।

ঠাকুর বললে, আমি দু'বেলা খেতে দিই, লক্ষ্য করবনা? খেতে বসেন নামমাত্র। ভালো-মন্দ কিছুতেই যেন রুচি নেই। আর আগে?

রামধন সভয়ে বললে, ওরে বাবা! রান্না মনের মতো না হলে কি বকাবকি!

—আর এখন যেন নির্বিকার।

—বলতে নেই; কিন্তু লক্ষ্য করেছ, গিন্নিমার কিন্তু সব ঠিক ঠিক আছে।

—যা বলেছিস। তুই তো বাবুর আগের বৌকে দেখেছিস। একবার তুলনা কর্ দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে রামধন বললে, তাঁর কথা থাক্, ঠাকুরমশাই। কিসে আর কিসে! তখন নতুন এসেছি, কত ভুলচুক হত। একটা দিন বকেননি। হাসতে হাসতে শুধু শুধরে দিয়েছেন: ওরে বোকা, অমন করে নয়, এমনি করে!

—ছুটে ছুটে বেড়াতেন, যেন মেঝেয় পদ্মফুল ফুটত। সব দিকে দৃষ্টি। এই শ্বশুরের জলখাবার, ওই শাশুড়ীর পান-দোক্তা, ওই স্বামীর কাপড়-জামা। আমরা যে চাকর-বাকর, আমাদের দিকেই কি কম দৃষ্টি!

হুজনেই বিষণ্ণভাবে বসে রইল।

ঠাকুর বললে, ভাগ্যি বলতে হবে, কর্তাবাবু গিন্নিমা আজ বেঁচে নেই।

—যা বলেছেন! তবে এও বলি, তাঁরা থাকলে হয়তো এমনটা হত না।

একটা ফুৎকার দিয়ে ঠাকুর বললে, না, হনাত! ওসব মেয়েকে কেউ সামলাতে পারে না। তাঁরা মরে বেঁচেছেন।

এ-কথার সারবত্তা রামধনও স্বীকার করল।

বিষণ্ণতা সম-বিষণ্ণের প্রতি ঔদার্য আনে। ঠাকুর তার লাল বটুয়াটি বের করে হুটো পান সাজলে। একটি রামধনকে দিলে, একটি নিজের মুখে পুরলে। হুটো বিড়িও বার করলে। একটি রামধনকে দিলে, একটি নিজে ধরালে।

বললে, মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানিস?

—কি?

—এ চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যাই। এ বাড়ীতে আর সুখ নেই। এ আর গেরস্ত-বাড়ি নয়, যেন হোটেল।

রামধন উৎসাহিত হয়ে সায় দিলে: যা বলেছেন ঠাকুরমশাই, হোটেলই বটে। ভূতে আনে, গন্ধর্বে খায়। দরদ বলতে কারও কিছু নেই।

—তবু আছি কেন জানিস? বাবুর জন্যে।

উৎসাহে রামধন দাঁড়িয়ে পড়ল: যা বলেছেন ঠাকুরমশাই, বাবুর জন্যে।

ঠাকুর বললে, আমাদের মহাদেবের মতো বাবু রে। তাঁকে ছেড়ে যাবো কোথায়? আমরা চলে গেলে কে তাঁকে দেখবে? তিনি কি আর বাঁচবেন? আর সেই সঙ্গে চারিদিকে একটা লুটপাট আরম্ভ হবে।

কিন্তু নিচের তলার খবর উপর-তলায় পৌঁছয় না। অপূর্ব এবং

সুমিত্রা শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে নিজের নিজের কক্ষপথে বিচরণ করতে লাগল। কেউ কারও খবর বড় নেয় না।

কিন্তু একদিন খবর নেবার দরকার হল।

অপূর্ব তার অফিস-ঘরে বসে মামলার নথিপত্র দেখছে, শান্ত পদক্ষেপে সুমিত্রা এল।

বহুদিন সুমিত্রা এ-ঘরে আসেনি। আজ তাকে আসতে দেখে অপূর্ব বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে।

শান্ত কণ্ঠে সুমিষ্ট হাস্যে সুমিত্রা বললে, কিছু টাকার দরকার ছিল।

এতদিন পরে কিছু টাকার দরকারে সুমিত্রা তার ঘরে এসেছে!

অপূর্ব কিছু বললে না। তার মুখে ভাবান্তরের কোনো রেখা ফুটতে দিলে না। কত টাকা চাই, কিসের জন্যে, কোনো প্রশ্ন করলে না।

শুধু নিঃশব্দে টেবিলের টানাটা খুলে একমুঠো নোট বের করে ওর সামনে টেবিলের উপর রাখলে। তারপর নথির দিকে মন দিলে।

সুমিত্রার চোখ একবার যেন জ্বলে উঠল। মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু একশোটা টাকা তার বিশেষ প্রয়োজন। ধীরে ধীরে দশখানা দশটাকার নোট গুনে নিয়ে ভ্যানিটিব্যাগের মধ্যে রাখলে। রেখেই চলে গেল না। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

জিজ্ঞাসা করলে, তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছ কেন?

নথি পড়তে পড়তে অপূর্ব বললে, কিরকম ব্যবহার?

—কথা বলা বন্ধ করেছ।

এবারে অপূর্ব মুখ তুলে চাইলে: কথা বলব কার সঙ্গে? তোমার দেখা পাই কখন?

—দেখা পাও না? কেন, আমি কি কলকাতার বাইরে থাকি?

—কোথায় থাক তুমিই জান। কিন্তু দেখা পাই না।

—পাও না, দেখা করতে চাও না বলে। রাত্রি সাড়ে ন'টায় ফিরলেও দেখি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। এত সকালে তুমি তো কখনও ঘুমুতে না।

—না। এখন পরিশ্রম যাচ্ছে খুব। ক্লান্ত হয়ে ফিরি। সকাল সকাল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। একদিন আটটায় ফিরে দেখো, ঘুমিয়ে পড়িনি।

সুমিত্রা বললে, আমার ফিরতে দেরি হয়। রিহার্সাল নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।

—কিন্তু এরকম কথা তো ছিল না।

—কি রকম কথা?

এবারে অপূর্ব সোজা ওর মুখের দিকে চাইলে। বললে, আমি বাইরের কাজ করব, তুমি ঘরের কাজ করবে। আমি বাইরের কাজে মন দিয়েছি, তুমি কিন্তু ঘরের কাজে মন দিতে পারলে না! সর্ত ভঙ্গ করলে।

সুমিত্রা বললে, সর্ত আবার কি? ওই আলু-পটল-উচ্ছে-বেগুনের মধ্যে আমি জীবন কাটাতে পারব না। তোমাকে খুশি করবার জন্যেও না।

—আমাকে খুশি করার কথা হচ্ছে না। কিন্তু ঘরের মধ্যে কি কোনো আনন্দ নেই?

—আমি তো খুঁজে পাই না।

—সব মেয়ে পায়, তুমি পাও না?

—না।

—আশ্চর্য!

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সুমিত্রা বললে, আশ্চর্যের কি আছে? সব মেয়েকে তুমি জান? আজকের দিনে অনেক মেয়েই পায় না।

—তাই দেখছি। ঘর ভেঙে যাচ্ছে।

—যাক। ঘরে যদি আনন্দ না থাকে, তাহলে ঘর ভাঙল আর থাকল, কি যায়-আসে?

অপূর্ব বিস্মিতভাবে ওর মুখের দিকে চাইলে: কিছুই যায়-আসে না?

—না।

—তবে মানুষ ভালবাসে কেন? ঘর বাঁধবার জন্যেই তো?

—না। আমি বলি আনন্দ পাবার জন্যে। আনন্দেই এর সুরু, আনন্দেই শেষ।

—মাঝখানে আর কিছু নেই?

—মাঝখানেও আনন্দ।

অপূর্ব হাসলে। বললে, আনন্দ বস্তুটা কি নিরালম্ব? তার কিছুর উপর ভর দেবার দরকার করে না?

—দুর্বল আনন্দের করে। কিন্তু যে আনন্দ বলিষ্ঠ, বেগবান, তার করে না। সাইক্‌ল্ যখন চলে না, তখন ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়। চলন্ত সাইকেলের ঠেস দরকার হয় না।

অপূর্ব বিমূঢ়ের মতো ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বললে, তাহলে অবলম্বনটা কোন কাজে এল? তারও তো কাজ দরকার। আমার পা আছে, চলতে পারি। চলতে পারি বলেই তো অবিশ্রান্ত চলি না। মাঝে মাঝে চেয়ারে বসি, খাটে শুই। নইলে ওগুলো নিরর্থক হয়ে পড়ে।

—আমি কি অবিশ্রান্ত ঘুরি? বিশ্রাম করি না?

অপূর্ব হেসে বলেল, বিশ্রামের কথা হচ্ছে না, অবলম্বনের কথা হচ্ছে। আমিও কাজ করি, খাটি, ঘুরি। কিন্তু সহস্র কাজের মধ্যেও তুমি আছ, আমার অবলম্বন। ঘরে ফিরি তোমার জন্যে। তোমাকে পাই না। তাতে বিশ্রামের অভাব ঘটে না, অবলম্বনের অভাব ঘটে। সুমিত্রা, ভালোবাসা নিরালম্ব নয়।

বিদ্রূপের ভঙ্গীতে সুমিত্রা হো-হো করে হেসে উঠল। বললে,

ছাখো, ওসব কবিত্বের কথা। বইতে পড়েছ। বাস্তব জীবনে ওর কোন্ মানে নেই।

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে অপূর্ব কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে রইল। তার পরে শান্ত মৃদু কণ্ঠে বললে, তাই দেখছি। তোমাকে আর আট্কাব না, সুমিত্রা। তোমার রিহার্সালের সময় বয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, যাই।

সুমিত্রা উঠল, কিন্তু দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এল।

—আর একটা কথা ছিল।

—বল।

—আমার একখানা গাড়ি হলে ভালো হয়।

অপূর্ব অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলে।

ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে সুমিত্রা বলে চলল: একখানা গাড়ি। তোমারই সব সময় দরকার হয়। আমার ঘোরা-ফেরায় খুব অসুবিধা হয়।

অপূর্ব হেসে বললে, পাবে।

ব'লেই নথিতে মন দিলে।

সুমিত্রা আরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল।

ও চলে যেতে অপূর্ব নথিপত্র একপাশে ঠেলে রেখে ভাবতে বসল:

সুমিত্রার আনন্দ বলিষ্ঠ বেগবান, বন্যার ঘোলা জলের মতো। যা শুধু প্রচণ্ড আঘাত দেয়। গড়ে না, ভাঙে। কি হয়তো গড়েও, যখন বেগ স্থির হয়ে আসে। জমিতে পলিমাটি রেখে যায়, নতুন সৃষ্টির জন্যে।

তার অবলম্বন দরকার নেই। কিন্তু মুহুর্মুহু টাকার দরকার আছে, গাড়ির দরকার আছে। কিন্তু সেই টাকা যে যোগায়, গাড়ির যে ব্যবস্থা করে, তাকে দরকার নেই!

অপূর্ব হাসলে।

ড্রয়ার আবার সে খুললে। একেবারে নিচের তাক থেকে একখানা ফোটোগ্রাফ বের করলে।

অপর্ণার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল কি করে কে জানে। কিন্তু গেল। মনে পড়ে গেল তার টেবিলের টানায় অপর্ণার একটা ফোটো আছে। ফ্রেমে বাঁধানো নয়। এইটি তার শেষ ছবি। তার কয়েক মাসের মধ্যেই সে মারা যায়। আর বাঁধানো হয়নি। নিজে নিরিবিলি দেখবে বলে ওইখানে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল।

সে কত কালের কথা।

তার পরে এল সুমিত্রা। সেও কতদিন পরে। তারপর ভুলেই গিয়েছিল ছবিটার কথা। আজ হঠাৎ মনে পড়তে বের করল।

মলাটের উপর ধুলো জমে গেছে।

রুমাল দিয়ে সস্নেহে সযত্নে তা মুছে চোখের সামনে ধরল। কত কাল পরে!

অপর্ণাকে সে বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল। লজ্জা পেলে ছবির দিকে চেয়ে।

তার যতগুলো ছবি তোলা হয়েছিল কোনটাই একলা নয়। একলা ছবি তোলায় অপর্ণার ভীষণ আপত্তি ছিল। যখনই তুলেছে, দুজনে মিলে তুলেছে। বহু কষ্টে রাজি করিয়ে এই একখানি মাত্র একলা ছবি তোলা হয়েছিল।

চমৎকার ছবিটি উঠেছিল।

বুকের কাছে দুই হাতে একগোছা পদ্মফুল। কিছুতেই নেবে না অপর্ণা। মাথার অবগুণ্ঠন কিছুতে খুলবে না। অপূর্ব কথা দিয়েছিল—এ ছবি আর কেউ দেখবে না। তখন বহু কষ্টে অপর্ণা এই ছবি তুলতে সম্মত হয়।

অপূর্ব কথা রেখেছিল। এ ছবি আজ পর্যন্ত সে ছাড়া দ্বিতীয়

কোন ব্যক্তি দেখেনি। রয়েছে তার ড্রয়ারে বন্ধ। শুধু তার দেখবার জন্যে।

অসাধারণ একটি ছবি।

সত্যিকার অপর্ণা, তার সুন্দর মনটি পর্যন্ত, শক্তিমান ক্যামেরার লেন্সে যেন ধরা পড়ে গেছে। ঠোঁটের নিগূঢ় হাসিটি পর্যন্ত।

চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ অপূর্ব দেখলে। যার কথা এর মধ্যে একদিনও বিশেষ করে ভাবেনি, আজ তাকেই দেখে যেন ওর আশ মিটছে না।

অপূর্বর চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে কোমল হয়ে এল। লক্ষ্মী-প্রতিমার মতো কল্যাণী মূর্তি। যে মেয়ে পুরুষের মনকে স্নিগ্ধ রাখে, সবুজ রাখে। প্রখর গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে যে কোমল ছায়া বিছায়।

তুমি কেন গেলে? কেন গেলে? তোমাকে আমার কত দরকার!

ছবিটা বাঁধানো দরকার।

কিম্বা একটা অয়েল-পেন্টিং।

অপূর্ব রামধনকে ডাকলে। বললে, বড়রাস্তায় যে ফোটো-গ্রাফির দোকান আছে জানিস্? যেখানে বাবার আর মায়ের ছবি অয়েল-পেন্টিং করা হয়েছিল?

- জানি, বাবু। ওই ওষুধের দোকানের সামনে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই ছবিটা নিয়ে যাবি। আমার নাম করে বলবি এটা অয়েল-পেন্টিং করতে হবে।

অপূর্ব ছবিটা ওর হাতে দিলে।

ছবিটা নিয়ে রামধন ছুটল রান্নাঘরের দিকে: ঠাকুর-মশাই, একটা কাণ্ড হয়েছে।

—কি কাণ্ড রে!

—এই দেখুন—

রামধন ছবিটা খুলে ঠাকুরকে দেখালে। বললে, বাবু বললেন, এটা অয়েল-পেন্টিং করতে হবে।

ছবিটা ভালো করে চেয়ে চেয়ে ঠাকুর দেখলে। বললে, কী রূপ বল্ দেখি! যেন লক্ষ্মী-ঠাকরুন।

—সত্যি।

—বাবু বললেন, অয়েল-পেন্টিং করতে হবে?

—হাঁ।

—এতদিনে বাবুর মনে পড়ল!

ঠাকুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে। ওরা সবাই অপর্ণাকে ভালোবাসত। অপূর্ব ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু ওরা ভুলতে পারেনি। অপর্ণার কথা মনে হলে এখনও ওদের বুকের ভিতর থেকে নিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

সুমিত্রা ওদের যে কোনো ক্ষতি করেছে তা নয়! কিন্তু অপর্ণার পাশে দাঁড় করিয়ে সুমিত্রাকে যখন দ্যাখে, তখন কি জানি কেন, সুমিত্রার সম্বন্ধে ওদের মন প্রসন্ন হয় না।

এতদিন পরে অপূর্ব যে ধুলো ঝেড়ে অপর্ণার ছবিটি বের করেছে, তার অয়েল-পেন্টিং করতে চাইছে, হয়তো বাবুর শোবার ঘরে টাঙিয়ে রাখা হবে, ভাবতেও ওরা আনন্দ পেলে।

॥ আট ॥

'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করলে। বিশেষ করে নাম-ভূমিকায় সুমিত্রার নৃত্য প্রচুর প্রশংসা অর্জন করলে। সমস্ত সংবাদপত্রে সুখ্যাতি করে সমালোচনা আর সেই সঙ্গে সুমিত্রার বিভিন্ন ভঙ্গীর ছবি প্রকাশিত হল। এই আশ্চর্য প্রতিভাময়ী সুন্দরীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সকলেই মুখর।

তরুণমহল থেকে কত যে স্তুতিপূর্ণ চিঠি আসতে লাগল তার সীমাসংখ্যা নেই। অধিকাংশ চিঠির উচ্ছ্বসিত ভাষার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা নিয়ে ওদের 'কল-কাকলী' ক্লাবে যথেষ্ট হাসাহাসি পড়ে গেল।

খবরের কাগজের ছবি ও সমালোচনা অপূর্বর চোখেও পড়ল। একবার উলটে-পালটে দেখে অন্য পৃষ্ঠার খবরে মন দিলে। বার-লাইব্রেরীতে বন্ধু-বান্ধব, যারা জানে সুমিত্রা তার স্ত্রী, অভিনন্দন জানালে। কিন্তু অপূর্ব তাতে খুব উল্লসিত হল বলে বোধ হল না।

অভিনয় শেষে নাচের পোশাকে রং-মাখা অবস্থাতেই সুমিত্রা বাড়ি ফিরেছিল। রাত্রি তখন দশটার বেশি নয়।

অভিনয়ের একখানা টিকিট অপূর্বকে দেওয়া হয়েছিল। অপূর্ব তার দাম দিয়েছিল, কিন্তু দেখতে যায়নি! যে-নাচ সকলে দেখল এবং দেখে আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হল, সেই নাচ শুধু অপূর্ব দেখলে না, এটা সুমিত্রার ভালো লাগেনি।

অপূর্ব কেন এল না সুমিত্রা জানে না। সে সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল আছে বলেও মনে হল না। হয়তো কাজের চাপে আসবার সময় পায়নি। কি হয়তো ইচ্ছা করেই আসেনি। সুমিত্রার কাছে এটা মুখ্য নয়।

নাচ যদি ভালো না হত, যদি মাঝারিও হত, অপূর্বের কথা হয়তো সুমিত্রার মনেও পড়ত না। কিন্তু যে নাচ দেখিয়ে দর্শক-চিত্তের শ্রদ্ধা অপরিমিতরূপে পেল, সেই নাচ শুধু তার স্বামী দেখলে না, এতে তার মন প্রসন্ন হল না।

সে নাচের পোশাকেই বাড়ি ফিরেছিল, স্বামীকে অন্তত একটা

নাচ দেখাবে বলে। অপূর্ব গুণী বলে নয়, নাচের সমাজদার বলেও নয়, স্বামী বলে।

গেটের দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে বাড়ির ভিতর ঠাকুর, রামধন এবং অন্যান্য দাস-দাসী তাকে এইভাবে প্রবেশ করতে দেখে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। এমন বেশে তারা সুমিত্রাকে কখনও দেখেনি।

এ কী রূপ!

সলজ্জিত বধূবেশে সুমিত্রা কখনই থাকে না। কিন্তু এ কি? এ যে আগুন!

ওরা সভয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল।

এতক্ষণে সুমিত্রা বোধহয় লজ্জা পেয়েছিল। মনে হয়েছিল, এই বেশে বাড়ি না এলেই ভালো করত। কিন্তু সে যা হবার হয়ে গেছে। আর উপায় নেই।

সুমিত্রা সোজা নিজের শোবার ঘরে এসেছিল।

অপূর্ব নিদ্রিত।

আলোটা জ্বেলেছিল। ভালো করে দেখেছিল—সত্যি ঘুমুচ্ছে, না কপট-নিদ্রা।

না, সত্যিই ঘুমুচ্ছে।

পোশাকটা ছাড়বার জন্যে বেরুতে যাবে, হঠাৎ চোখ পড়েছিল অয়েল-পেন্টিংটার দিকে। চিনতে বিলম্ব হল না। অপর্ণার ছবি। সে ইতিপূর্বে অনেকবার দেখেছে।

হঠাৎ অপর্ণার ছবি এখানে কেন?

কে আনলে? নিশ্চয় অপূর্ব।

কিন্তু কেন?

সুমিত্রা অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ছবির দিকে চেয়ে ছিল। সুন্দরী নিশ্চয়ই। মেঘে-ঢাকা চাঁদের মতো। কোনো চাকচিক্য নেই, তীক্ষ্নতা নেই। কেমন বোবা রূপ। যেমন অপূর্ব নিজে।

সুমিত্রা হেসেছিল ঃ দুজনে রাজযোটক হয়েছিল।

সে পোশাক ছাড়তে অন্য ঘরে গেল। শুধু পোশাক ছাড়া নয়, মুখের রং তোলা আছে। তাতে অনেক সময় গেল।

সমস্ত হওয়ার পর আর কিন্তু সে এ-ঘরে ফিরল না। পাশের ঘরে, যে ঘরে তার শাশুড়ী শুতেন, সেই ঘরে খোলা মেঝেয় শুয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন অপূর্ব ছাখে পাশের খাটে সুমিত্রা অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে।

সেদিন তার ব্যতিক্রম হল।

পাশের খাটে সুমিত্রা নেই। কি ব্যাপার? নৃত্যানুষ্ঠান সেরে কি আর ফিরতে পারেনি? না-ফেরবার কি আছে? অনুষ্ঠান শেষ হতে বড়জোর সাড়ে নটা কি দশটা। তার পরে বাড়ি ফিরবে না তো কোথায় যাবে?

যেখানে যাক, সেজন্যে চিন্তা করে লাভ নেই।

অপূর্ব উঠল।

ঘর থেকে বেরিয়ে মায়ের ঘরের পাশ দিয়ে যেতেই খোলা জানালা দিয়ে চোখে পড়ল, খোলা মেঝেয় সুমিত্রা গভীর ঘুমে অচেতন।

সুমিত্রা ও-ঘরে কেন?

অপূর্ব আশ্চর্য হল। নিজের খাটে না শুয়ে সুমিত্রা মায়ের ঘরে অমন করে ভূমিশয্যা গ্রহণ করলে কেন?

কিন্তু সুমিত্রার কাছে বিস্মিত হবার দিন চলে গেছে।

সেদিন এই পর্যন্ত।

দুপুরে বার-লাইব্রেরিতে বন্ধু-বান্ধবের অভিনন্দন এবং পরদিন সকালের কাগজে সুমিত্রার বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গীর ছবি ফলাও করে ছাপা।

কিন্তু সুমিত্রার দেখা নেই। অপূর্ব জানেও না সেই রাত্রে

অভিনয়-শেষে সুমিত্রা সেই নাচের পোশাকে এসেছিল তার শয়ন-কক্ষে। ভিড়ের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে নয়, একান্ত করে এবং বিশেষ করে তাকেই একটা নাচ দেখাবার জন্যে। অপূর্ব তখন ঘুমুচ্ছিল।

বাড়ির দাসী-চাকর ছাড়া এই গোপন কথা কেউ জানে না।

অপূর্ব সুমিত্রাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। সুমিত্রাও তাকে এড়িয়ে চলে। এর উপর নতুন উপসর্গ, সুমিত্রা এখন শাশুড়ীর ঘরে শোয়। অপূর্বর বুঝতে বেশি বিলম্ব হল না, কেন শোয়!

নিশ্চয় অপর্ণার ছবিটার জন্যে।

অপূর্ব মনে মনে খুশিই হল। সুমিত্রাকে একটা আঘাত সে দিতে পেরেছে।

পাছে সুমিত্রা দুঃখ পায় বলেই অপর্ণার কোনো ছবি অপূর্ব এ-ঘরে এতদিন টাঙায়নি। আজ মনে হল, আরও অনেক আগেই ছবিটা এ-ঘরে টাঙানো উচিত ছিল। আরও অনেক আগেই সুমিত্রার আঘাত পাওয়া দরকার ছিল।

কিন্তু শুধু আঘাত দেবার জন্যেই নয়, অনুভব করছে ওর মন থেকে সুমিত্রা যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। আর সেই শূন্য স্থানে এগিয়ে আসছে অপর্ণা। মৃত অপর্ণা, যে শুধু স্মৃতি মাত্র, যার আর দেবার কিছু নেই।

তবু অপর্ণাকে যেন ও আবার নতুন করে পেতে আরম্ভ করেছে, যে শুধু ছবি, পটে আঁকা, তারও একটা সত্তা আছে। তার সঙ্গে মনে মনে কথা বলা যায়। চেষ্টা করলে তার কথা শোনাও যায়।

কিছু পুরোনো কথা। কিছু নতুন কথাও।

সুমিত্রা আর এ-ঘরে শোয় না, শেষ রাত্রে কোনো কোনো দিন ঘুম ভেঙে যায়। জানালা দিয়ে রাস্তার আলোর একটা টুকরো এসে পড়ে ওই ছবির উপর। অপর্ণার চোখ-দুটি যেন করুণায় ছলছল করে।

অপূর্ব মুগ্ধনেত্রে চেয়ে ছাখে।

সে যেন অপর্ণাকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করবার সাধনায় মেতে উঠল।

অপর্ণাকে তার প্রয়োজন।

কি প্রয়োজন ?

অপূর্বর পক্ষে জবাব দেওয়া কঠিন।

পার্থিব কোনো প্রয়োজন নয়। তা ছাড়াও মানুষের প্রয়োজন থাকে। যা পার্থিব নয়, যা বস্তুজগতের কিছু নয়, তারও জন্যে মানুষের তীব্র ক্ষুধা আছে।

জীবন এবং মৃত্যুকে রামধনুর মতো সেতু দিয়ে বেঁধেছে স্মৃতি। স্মৃতির জগৎ স্বতন্ত্র। স্মৃতি এই পৃথিবীর মধ্যেই সীমিত নয়। বস্তুজগতের বাইরেও তার অবাধ গতিবিধি।

সেই পথে অপূর্বর গতিবিধি আরম্ভ হয়ে গেল। একটা আনন্দ-উজ্জ্বল স্বপ্ন-সরণি।

তারই মধ্যে অপূর্ব ডুবে গেল।

দেখতে দেখতে অপূর্বর মধ্যে একটা পরিবর্তন আসতে লাগল। পরিবর্তন এত স্পষ্ট হতে লাগল যে, বন্ধু বান্ধবের চোখেও পড়তে লাগল।

বলে, কি হে! স্ফূর্তি কমে গেল যে!

অপূর্ব হাসে। বলে, কম দেখছ কোথায় ?

—কি জানি, কিছুতে তোমার যেন তেমন উৎসাহ দেখি না।

হাসতে হাসতে অপূর্ব বলে, লম্ফ-ঝম্পের উৎসাহ আমার আর কবে ছিল ?

—না, তা ছিল না, তুমি বরাবরই একটু শান্ত-শিষ্ট মানুষ ; কিন্তু যেন আরও শান্ত হয়ে যাচ্ছ।

—সে তো সুলক্ষণ। বয়স তো বাড়ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে মন শান্ত হয়ে আসাই স্বাভাবিক।

বন্ধু হেসে ফেললে,—এই ক'মাসে বয়স তো আর পঞ্চাশ বৎসর বাড়েনি।

ক'মাস তো বেড়েছে। সেই কি কম!

তারপরে অপূর্ব নিজে বললে, কি জান, মামলা-মোকর্দমা আর তেমন ভালো লাগছে না।

—সে কি হে! মামলা-মোকর্দমা ভালো লাগেনা কি? সত্যি কথা বলতে কি, সে দিনের অমন সুন্দর মামলাটা শুধু তোমার ঔদাসীন্যে ঘাটে এসে ডুবে গেল। এ তো ভালো কথা নয়! এরকম করলে তো প্র্যাক্‌টিস থাকবে না।

অপূর্ব বললে, প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে দোব ভাবছি।

বিস্ময়ে বন্ধুর চোখ কপালে উঠলো।

বললে, সে কি হে! এমন জমানো প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে দেবে?

—তাই ভাবছি।

—দিয়ে কি করবে?

—কিছুই করব না। কিছুই করতে আমার ভালো লাগছে না।

বন্ধু বললে, এ বাতিক তোমার ছিল। বাপ পয়সা রেখে গেছেন, কিছু না করলেও চলে; তারপরে আবার সেই পুরোনো বাতিক ফিরে এল?

—বাতিক নয়।

—তবে? শরীর খারাপ?

—শরীরও তেমন খারাপ বুঝি না।

—তবে? কবিতা লিখছ?

অপূর্ব হেসে ফেললে: না হে, কবিতা টবিতা আমার আসে না।

—তবে কি গুরুদেবের খপ্পরে পড়েছ?

—সে আবার কি!

বন্ধু বললে, জান না? বাংলাদেশে ছেলে-ছোকরারা হয় কবিতা লেখে, নয় রাজনীতি করে। তারপরে উদরান্নের চেষ্টায় পাঁচটা ধান্ধায় ঘোরে। চল্লিশ পার হয়ে যখন ছাখে সুবিধা হচ্ছে না, তখন একটা গুরুদেবের কাছে জোটে।

—পরলোকের ব্যবস্থায়?

—সে তো পরের কথা। আপাতত ইহলোকের ব্যবস্থায়।

গুরুদেব কি করবেন?

—অনুগ্রহ হলে সবই করতে পারেন। দু'দশ লাখ টাকাও পাইয়ে দিতে পারেন। তাঁরা না-পারেন কি?

অপূর্ব হেসে বললে, না ভাই, টাকার অভাব বিশেষ অনুভব করছি না।

—তাহলে কি?

হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে বন্ধু বললে, প্রেমে পড়নি তো? বুড়োবয়সে প্রেম কিন্তু চোরাবালির মতো। ওপর থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু পা দিয়েছ কি আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আর ওঠবার উপায় থাকে না।

অপূর্ব হো হো করে হেসে ফেলল: পাগল না ক্ষ্যাপা!

—পাগল না হলেই ভালো। ওসব কিছু নয় হে! ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। এ ক্লৈব্য ঝেড়ে ফেল।

অপূর্বও ভাবে এ-কথা। এ কি কৈব্য? এ কি? তার এমন হচ্ছে কেন? কিছু ভালো লাগে না কেন? মৃতার সঙ্গে মানস-রতি, সকল সময় চিন্তার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা—এ তো তার ছিল না। একী নেশা পেয়ে বসল?

অপর্ণা যেন তাকে অক্টোপাশের মতো বেঁধে ফেলেছে। অপর্ণা নয়, তার ছবি। কোর্ট থেকে ছুটে আসে ছবির সঙ্গে কথা বলবার জন্যে। যেন একটা অদৃশ্য শিকল দিয়ে ছবি যেন তাকে সব সময় টানছে!

॥ নয় ॥

'কল-কাকলী'র আড্ডা খুব জমে গেছে। সকল সময় একদল না একদল আছেই এবং আড্ডা জমাচ্ছে। তার সঙ্গে কয়েকজন নিষ্কর্মা বড়লোকের ছেলেও জুটেছে। কেউ পড়ে, কেউ বা সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে। এরা দলের পৃষ্ঠপোষক। টাকা দিয়ে, প্রচার করে দলের অনেক সাহায্য করে।

সুমিত্রা এদের মধ্যমণি।

সে সকালে চা খেয়ে আসে। বারোটায় বাড়ি ফেরে। আবার বিকেলে যায়। ফেরে রাত্রি দশটায়। আড্ডাটা সে থাকলেই বেশি জমে।

—সুমিত্রাদি, বর্ধমানে যাবে?

—কি জন্যে? সীতাভোগ খেতে?

—তাও আছে। তার সঙ্গে নাচও দেখাতে হবে।

ইতিপূর্বে রাঁচি থেকে একটা বায়না এসেছিল। কিন্তু এদের সকলেই ভদ্রঘরের মেয়ে। সৌখীন দল, পেশাদার নয়। সুমিত্রা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল।

বর্ধমান দূরে নয়।

ওদের আপত্তি বাইরে রাত্রিবাসে। বর্ধমান যেদিন যাবে, সেদিনেই ফিরে আসতে পারবে। চাই কি, দুটো স্টেসন-ওয়াগন ব্যবস্থা করেও যাতায়াত করতে পারে। ট্রেনের টাইম-টেবলের উপর নির্ভর করতে হয় না।

সুমিত্রা ভাবতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলে, কেউ কি এসেছিল?

—হ্যাঁ। তোমার সম্মতি পেলেই তারা এসে দেখা করবে। সমস্ত কথাবার্তা বলবে।

অনেকদিন ওদের কোনো 'শো' হয়নি। দলের ছেলে-মেয়েরা ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠেছে।

সবাই সুমিত্রার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল : হ্যাঁ সুমিত্রাদি, রাজি হয়ে যাও।

সুমিত্রা বললে, আমরা বাইরে কখনও যাইনি।

—বর্ধমানকে আর বাইরে বোল না। ক'ঘণ্টারই বা রাস্তা। এখান থেকে খেয়ে-দেয়ে বেরুলে আবার রাত্রে বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে।

সুমিত্রা হেসে বললে, খাওয়া-দাওয়ার কথা ভাবছি না।

—তবে ?

বাইরে যাওয়ার প্রশ্নটাই ভাবছি। এইজন্যে রাঁচির বায়না নিলাম না।

—কিন্তু বর্ধমান তো দূর নয়।

সুমিত্রা হেসে বললে, একবার বাইরে যেতে আরম্ভ করলে তখন আর দূর বলে কিছু থাকবে না।

—কেন থাকবে না ? রাঁচি নিয়ে আমরা কি কোনো কথা বলেছি ?

সুমিত্রাকে রাজি হতে হল।

জিজ্ঞাসা করলে, ক'দিনের প্রোগ্রাম ?

—সে-কথা হয়নি। তুমি রাজি হলে তাদের আসতে বলব।

—আমরা এখান থেকে মোটরে যাব-আসব।

—সে-কথা তাদের বোলো।

—আচ্ছা, তাদের খবর দাও।

সুমিত্রার মনের মধ্যে একটু দ্বিধা ছিল। কিন্তু অনেকদিন কোথাও অভিনয় না হওয়ায় অন্যান্য সকলের মতো সেও ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

বেশ তো। মন্দ কি ?

কলকাতা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। একঘেয়ে হয়ে আসছে। কলকাতা আর ভালো লাগছে না। কাছাকাছি কোথাও থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ঘুরে এলে মন্দ কি?

কিন্তু বাইরে থাকবে না রাত্রে। সেটা ঠিক নয়। এখান থেকে বরাবর মোটরে যাবে, অভিনয় করবে এবং যত রাত্রিই হোক, অভিনয় শেষ হলেই বাড়ি ফিরবে।

সুমিত্রা বললে, ওদের খবর দাও তাহলে।

বর্ধমান থেকে লোক এল।

'কল-কাকলী' পেশাদার দল নয়। সুতরাং সেদিক দিয়ে অর্থের প্রশ্ন নেই। কিন্তু এতগুলি লোকের যাওয়া-আসা, সজ্জা এবং অন্যান্য বারবরদারী খরচ আছে। বর্ধমানের উদ্যোক্তারা সে-বিষয়ে তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে গেল।

কিন্তু প্রশ্ন হল, রাত্রে থাকা নিয়ে।

রাত্রিবাস দরকার হবে এইজন্যে যে, অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে অবশ্য সন্ধ্যার সময়ই। কিন্তু স্থানীয় অনুষ্ঠানে ঘণ্টা দুই সময় নেবে।

সম্পাদকের নিবেদন আছে, সভাপতির ভাষণ আছে, আবৃত্তি ও সঙ্গীত আছে, তার উপর আছে স্থানীয় জেলা-শাসকের নবমবর্ষীয়া কন্যার নৃত্য। এর কোনটাই বাদ দেবার নয়।

বস্তুত এগুলোই মুখ্য অনুষ্ঠান। কিন্তু তাতে টিকিট বিক্রি অথবা লোক-সমাগমের সম্ভাবনা অল্প বলেই, খরচ করে বাইরে থেকে নাচের দল নিয়ে যেতে হচ্ছে!

সুতরাং কল-কাকলীর অভিনয় আরম্ভ হতে ন'টা।

ওরা জিজ্ঞাসা করলে, অভিনয় শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে?

—ঘণ্টা দুই তো বটেই।

—তাহলে এগারোটা হবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া আছে, জিনিসপত্র গোছগাছ আছে। সেসব সেরে বেরুতে একটা হবে। আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু রাত্রে মোটরে বার হওয়া কি নিরাপদ হবে?

সে একটা চিন্তার বিষয়।

কিন্তু—সুমিত্রা বললে,—আমরা বাইরে কোথাও যাই না শুধু রাত্রে থাকতে হবে বলে। আপনাদের অনুষ্ঠান-সূচী আর একটু খাটো করা যায় না?

লোকটি হেসে বললে, যাবে না কেন? ওগুলো কিছুই নয়। কিছুই নয়। কিন্তু খাটো করতে গেলে বিপত্তি আছে।

কিছুই যদি নয়, তাহলে বিপত্তি কি?

—ওরাই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। ওরা খাটছে, ওদের অভিভাবকেরাই চাঁদা দিচ্ছে। যদি শোনে, ওরা আবৃত্তি করতে পাবে না, গান গাইতে পাবে না, তাহলে ফ্যাসাদ হবে।

তাও ঠিক।

লোকটি বললে, এক কাজ করা যেতে পারে।

—কি কাজ?

—রাত্রিটা থাকলেই ভালো হয়। তবে থাকতে যদি নিতান্তই আপত্তি থাকে তাহলে, ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, তাঁকে বলে আপনাদের সঙ্গে সশস্ত্র সিপাহীর ব্যবস্থা বোধ হয় করা যেতে পারে।

—সেই সবচেয়ে ভালো।

কল-কাকলী উল্লসিত হয়ে উঠল।

উৎসাহের মধ্যে নীতি কুটোর মতো ভেসে যায়। একবার যাওয়া স্থির হলে মাঝখানের বাধা বড় বিরক্তিকর বোধ হয়। রাঁচি যাব না স্থির করেছিল, গেল না, সে কিছু নয়। কিন্তু বর্ধমান যাওয়া ওরা মনে মনে স্থির করে ফেলেছিল। ইতিমধ্যে ফেরার

বাধা তাদের উৎসাহের জোয়ারের যখন পথরোধ করলে, তখন উৎসাহ ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফেনিল হয়ে উঠল।

যে লোকটি এসেছে ওদের সঙ্গে কথা বলতে সে ম্যাজিষ্ট্রেট নয়, তাঁর প্রতিনিধিও নয়। তার মুখের আশ্বাসের সত্যকার মূল্য কতটুকু কে জানে!

অথচ ওর মুখের সামান্য একটা উল্লাসে দলের সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল। এ হল বন্যায় বাঁধ-ভাঙার উল্লাস। ওই আশ্বাসের ছিদ্রপথ দিয়ে বন্যার জল প্রবেশ করতে সুরু করেছে। বাঁধ ভাঙতে আর বিলম্ব নেই।

বর্ধমান যাওয়ার কথা পাকা হয়ে গেল।

কিন্তু গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বর্ধমানেই শেষ হয়নি। ওদের পা খুলে গেল। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড-ও। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে যাবার বাধা-বন্ধও।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।

একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। চিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণ অজগরের মতো পড়ে আছে রাস্তা। সেই রাস্তায় পাল্লা দিতে দিতে চলেছে দুখানা স্টেশন-ওয়াগন আর সুমিত্রার মোটর। কোথাও দু'পাশে উন্মুক্ত ধানক্ষেত, কোথাও-বা ঘন গুল্মের জঙ্গল।

কি আনন্দ, কি উল্লাস!

এমনি করতে করতে বর্ধমানে গিয়ে যখন পৌঁছুলো তখন সন্ধ্যা হয়নি।

দুটি ছেলে আগে-আগেই এসেছিল ওদের জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে রাখতে। ওদের থাকবার জন্যে চমৎকার একটি

বাড়ির ব্যবস্থা হয়েছিল। অভ্যর্থনার অন্যান্য আয়োজনও ত্রুটিহীন।

ব্যবস্থা দেখে ওরা খুব খুশি হল।

স্নান এবং চা-পান সেরে ওরা হল্-এ গেল। অনুষ্ঠান তখন সবে সুরু হচ্ছে। ওরা আর সেদিকে গেল না। সাজঘরে চলে গেল। অনেকগুলি ছেলে-মেয়ের সাজ সজ্জা আছে। সেও কম সময় লাগবে না।

ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিলেন। এদের অভিনয় আরম্ভ হতে ন'টাই বাজল।

এ-দিনও নৃত্য-গীত বড় চমৎকার হল। শহরের বিশিষ্ট নাগরিকেরা এবং পুরুষেরা সুমিত্রাকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানালেন।

সেই সঙ্গে অনুরোধ জানালেন, আরও একদিন অভিনয় করবার জন্যে।

এমন বড় একটা হয় না। ওরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। একটা দিনের ব্যবস্থা করেই ওরা এসেছে। আজ ফিরে যাবে। ফের কাল আসা।

ওঁরা বললেন, সে অনেক কষ্ট। তার চেয়ে ভালো হয় রাত্রিটা এখানে থাকুন। আপনাদের কোন অসুবিধা যাতে না হয় সেদিকে আমরা দৃষ্টি রাখব।

এরা বললে, স্টেশন-ওয়াগন দুটো একদিনের কড়ারেই আনা হয়েছে।

ওরা বললে, ছেড়ে দিন ও-দুটো, তার খরচ আমরা দোব। আর কাল সকাল-সকাল শুধু আপনাদের অভিনয়। অন্য কোনো থাকবে না। দশটার মধ্যে আপনাদের পৌঁছে দেবার ভার আমাদের উপর রইল।

বললে, রাত্রিটা বিশ্রাম করুন। এখানে কিছু কিছু দ্রষ্টব্য আছে। কাল সকালে সেগুলো দেখাবার ব্যবস্থাও হবে

মুগ্ধনেত্রের সকাতর অনুরোধ।

প্রশংসার একটা নেশা আছে। বহুজনের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় মোহ-বিস্তার করে। মোহ ষ্টেশন-ওয়াগনের ড্রাইভারদের পর্যন্ত স্পর্শ করলে। তারা ভাড়া এসেছিল। অভিনয় দেখতে দেখতে তারাও কখন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। তারাও দলের লোক হয়ে গেছে। তারাও দলের লোক হয়ে গেল।

বললে, কিচ্ছু চিন্তা নেই। আমরাও থেকে যাব। কাল রাত্রে একেবারে দল বল নিয়ে কলকাতা ফিরব।

ভালোই হল।

সকলেই জানে এদের পেশাদার দল নয়। সকলে বিশিষ্ট ঘরের সন্তান। সুতরাং অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছিল রাজকীয়। শহরের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তো বটেই, স্বয়ং জেলা-শাসক, সদর-মহকুমা-শাসক এবং পুলিশ-সুপার নিজে এসে অতিথিদের সুখ-সুবিধার কোন ত্রুটি হচ্ছে কিনা দেখে গেলেন।

একটা বাগান-বাড়িতে ওদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে ছাখে বাইরে ফটকের কাছে একটা প্রকাণ্ড ভিড় জমে গেছে। তার মধ্যে ছাত্রই বেশি। কিন্তু প্রবীণ ও নবীন ভদ্রলোক থেকে পান-বিড়িওয়ালা এবং সাইক্‌ল-রিক্সাচালক পর্যন্ত সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিই আছে।

সেই প্রকাণ্ড জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্যে ফটকে একদল লাল-পাগড়ি পুলিশও এসেছে।

গৌরবে, গর্বে এবং আনন্দে 'কল-কাকলী'র বুক ভরপুর। কলকাতা শহরে সিনেমা-অভীনেত্রীদের নিয়ে মাঝে মাঝে এমনি বিভ্রাট বাধে বটে, কিন্তু তাদের ভাগ্যে এমন কখনও ঘটেনি। এই প্রথম ঘটল।

সুমিত্রা বললে, মাঝে মাঝে আমাদের বাইরে বেরুনো দরকার।

—আমরা তো বলি সুমিত্রাদি, তুমিই রাজি হও না। দেখছ তো কি সম্মান!

ওদের তো বটেই, মায় ড্রাইভার দুজনের চালও বদলে গেল। তাদের চলা-ফেরাও লাটসাহেবের এডিকং-এর মতো। এত সম্মান তারাই বা আর কোথায় পেয়েছে?

সকালে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে এলেন ওদের খবর নিতে। জানতে, কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা।

তিনি মহকুমা-শাসককে ওদের সঙ্গে লোক দেবার ব্যবস্থা করতে বললেন। সে সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান ওদের দেখিয়ে নিয়ে আসবে।

সর্বাগ্রে মহকুমা-শাসকের জীপ। তারপরে সুমিত্রার গাড়ি। পিছনে দু'খানা ষ্টেশন-ওয়াগন যেন মিছিল করে বার হল।

ওদের একটু দর্শনলাভের জন্যে যে ভিড় গেটের গোড়ায় জমেছিল, পুলিশের তাড়ায় তারা রাস্তার দু'পাশে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

সেই মুগ্ধ জনতার শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ওদের গাড়ির মিছিল চলল।

কল-কাকলী আনন্দে অভিভূত।

সুমিত্রা চুপি চুপি তার পাশের বেহালা-বাদককে বললে, কলকাতায় এটা বড় দেখা যায় না। পথে নামলে সেখানে সব একাকার হয়ে যায়। তখন আর কেউ কারও দিকে ফিরেও চায় না।

বেহালা-বাদক কুণাল বললে, এরা সেই ভোর থেকে দাঁড়িয়ে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তোমাকে দেখবার জন্যে।

—যাঃ!

—সত্যি। কেমন করে তোমার দিকে চেয়ে আছে দেখছ

না? আর একটু ভালো করে বস, যাতে আরও ভালো করে তোমাকে দেখতে পায়। ওদের প্রতীক্ষা জয়যুক্ত হোক।

সুমিত্রা হাসলে।

সঙ্গে সঙ্গে ছু'পাশের জনতার একটা আনন্দ-কোলাহল উঠল।

বেহালা-বাদক বললে, দেখছ? ওরা ভাবলে, ওদের দেখে হাসলে তুমি। তাই এই উল্লাস।

সুমিত্রা ধমক দিলে: চুপ!

বেহালা-বাদক চুপ করলে না। বললে, তুমি তো জান না সুমিত্রাদি, ওদের চোখে তুমি কি?

—কি আমি?

—তা আমিও জানিনে। কিন্তু যাঁর জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা এখানে এসেছি, তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন এবং ওই পাশের রাস্তা দিয়ে এই মুহূর্তে যেতেন, তাঁকে জনহীন পথ নিতে হত।

—কেন?

—ও-পাশের রাস্তার সমস্ত লোক তো এই রাস্তায় কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে, দেখছ না?

বেহালা-বাদক হাসলে।

আদর-আপ্যায়ন ও আনন্দ-উল্লাসে এই কয় ঘণ্টা ওদের জীবনে একটা স্বর্গবাস। ওরা অনুতাপ করছে, এর আগে রাঁচির আমন্ত্রণ কেন তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেখানেও নিশ্চয় এই অভ্যর্থনাই তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

বাইরে না বেরুলে দৃষ্টি খোলে না, বর্ধমানে এসে সে-কথা তারা প্রথম উপলব্ধি করলে।

এ দিনের অভিনয়ও অপূর্ব হল।

সুমিত্রার নাচে আঙ্গিকের দিক দিয়ে ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু তার মস্ত গুণ হচ্ছে, যে ভূমিকায় সে নামে সেই ভূমিকা যেন তাকে অভিভূত করে ফেলে। অভিনয়ে সে প্রাণ ঢেলে দেয়।

রসিক-চিত্ত জয়ে তার রহস্য এইখানে। নাচে শুধু তার পা নয়। তার চরণ এবং দেহের সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মাও বিভিন্ন ভঙ্গিমায় হিল্লোলিত হয়ে ওঠে। নূপুর-নিক্কণের সঙ্গে সঙ্গে বাজে তার আত্মা।

পর পর দু'দিনের অভিনয়ে বর্ধমানের হৃদয় ওরা জয় করে ফেললে। এরকম উচ্চাঙ্গের নৃত্য-নাট্য মফস্বল শহরে বড় একটা আসে না। কলকাতা গিয়ে এই শ্রেণীর অভিনয় দেখে আসার সৌভাগ্যও সকলের ঘটে না। সাফল্যের সেও একটা মস্ত বড় কারণ সন্দেহ নেই।

অভিনয়-শেষে ওদের বিদায় দিতে বর্ধমান শহর যেন ভেঙে পড়ল।

সকলের মুখে এক কথা: আবার কবে আসছেন?

—আবার যখন ডাকবেন।

সকলের চোখ ছলছল করছে। যেন আত্মার আত্মীয়কে বিদায় দিতে হচ্ছে।

সুমিত্রাদের চোখও শুষ্ক নয়।

এরকম অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে এই প্রথম।

কলকাতায় এমনতর ঘটে না। অভিনয় ভালো হয়, মন্দ হয়। দর্শকেরা ছ্যাখে। অদৃষ্টে কখনও নিন্দা জোটে, কখনও বা প্রশংসা।

কিন্তু তাও অভিনয়ের মতোই সাময়িক।

ওরা সাজ-পোশাক খোলে। বুকিং-অফিসের হিসাব নেয়। দেনা-পাওনা মেটায়। বাড়ি ফেরে।

কিন্তু এ অন্য।

বর্ধমান যখন এসেছিল, কি হুল্লোড় করেই না এসেছিল। কিন্তু ফিরছে স্তব্ধভাবে। সকলের বুক কি যেন একটা অব্যক্ত আনন্দ-বেদনায় ভারী।

সামনে সেই কৃষ্ণবর্ণ রাজপথ মোটরের আলোয় ঝিকমিক করছে। পথ নির্জন। মাঝে মাঝে দু'একটা মোটর এবং লরীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। দু'একটা প্রমোদ-ভ্রমণের মোটর ওদের অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে।

ওরা স্তব্ধ। ওরা শান্ত।

নিঃশব্দে চলেছে মোটর-গাড়ির মিছিল।

॥ দশ ॥

প্রকাণ্ড বড় একটা মালা এল। ফুল এল প্রচুর। ধূপ-ধুনা-গুগ্‌গুল এল।

অপর্ণার জন্মতিথি কবে অপূর্বর জানা নেই। না বার, না মাস, না বৎসর! মৃত্যুতিথি পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। রায়বাহাদুর ডায়েরী রাখতেন। সেগুলো নষ্ট হয়নি, আছে। তাদের পরিবারে অপর্ণার মৃত্যু একটা মস্ত বড় ঘটনা। তার তারিখ সেই বৎসরের ডায়েরীতে নিশ্চয় লিপিবদ্ধ আছে।

কিন্তু মৃত্যুকে অপূর্ব স্বীকার করে না।

গত কয়েক মাস ধরে অপর্ণাকে উপলক্ষ্য করে মৃত্যুর কথা সে ভেবে আসছে।

ভেবে এই সিদ্ধান্তে সে পৌঁছেচে যে, মৃত্যু নেই।

মৃত্যু নেই। অনন্ত কালে শুধু নিরবচ্ছিন্ন জীবনের জয়যাত্রা। নদীর ধারা অনেক সময় পাহড়ের গুহায়, বনের অন্ধকারে হারিয়ে

যায়। চোখে দেখা যায় না। যা চোখে দেখা যায় না, তা নেই নয়। তাও আছে।

যে মানুষটিকে আর চোখে দেখা যাচ্ছে না, যার কথা কানে শোনা যাচ্ছে না, যাকে স্পর্শ করা যাচ্ছে না, সেও নেই নয়।

মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের একটা সীমা আছে। আমরা সব দেখতে পাই না, সব শুনতে পাই না। সব কিছুর আঘ্রাণ পাই না, সব কিছু স্পর্শ করতে পারি না। তার বাইরে জগৎ আছে।

সে-জগৎ মনের জগৎ।

মন অনন্ত শক্তির অধিকারী। সে সব দেখতে পারে, শুনতে পারে, স্পর্শ করতে পারে। সে সব জায়গায় যেতে পারে। যা আছে, আর যাকে আমরা নেই বলি, সমস্ত কিছু সে আয়ত্তে আনতে পারে।

অনায়াসে হয়তো নয়। কিন্তু সাধনা করলে পারে। সমস্তই জানতে পারে। কিছুকাল থেকে অপূর্বর মধ্যে সেই সাধনা চলছে। তার বিশ্বাস, অপর্ণা আছে, সে হারিয়ে যায়নি, ফুরিয়ে যায়নি। মন দিয়ে তার নাগাল সে পেয়েছে।

যেমন সুমিত্রা আছে,—তেমনি অপর্ণাও আছে।

কতকাল সে তো সুমিত্রাকে দেখতে পায়নি। তাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পায়নি। তাই বলে কি সে নেই?

সে আছে। অপর্ণাও আছে।

সুতরাং মৃত্যুতিথি নয়! যে তিথিতে সে একদিন এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীতে এসেছিল, সেও কিছু নয়! সেও তার অনন্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন জীবনধারার একটি বিশেষ অধ্যায়কে চিহ্নিত করার একটা সংকেত মাত্র।

যে-কোনদিন যে-কোন মানুষের জন্মতিথি হতে পারে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত তার জন্মক্ষণ। প্রত্যেকটি মুহূর্তে তার মৃত্যু হচ্ছে, আর নতুন

করে জন্ম হচ্ছে। মহাকালের সূতায় অসংখ্য জন্ম আর অসংখ্য মৃত্যুর ফুলে গাঁথা হচ্ছে এক অন্তহীন মহাজীবনের মালা।

যে-কোনদিন অপর্ণার জন্মতিথি।

ধরা যাক, আজই সেই জন্মতিথি। তার কাছে হৃদয়ের প্রেম ও শ্রদ্ধা নিবেদনের উপলক্ষ্য তিথি।

স্থির করলে, আজ আর কোর্টে যাবে না।

কোর্টে যাওয়া তার ধীরে ধীরে কমে আসছে। মামলা-মোকর্দনায় আর সে উৎসাহ বোধ করছে না। ছোট গবাক্ষপথে ওখানে জীবনের একটা দিক সে দেখছিল। তার কৌতূহল জাগছিল। অনুরাগও।

আজ সে মহাজীবনের উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে এখন আর সংকীর্ণ জীবন নয়, মহাজীবনে অনন্ত লীলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারের যবনিকা সরে গেছে।

তার সামনে অন্য লোক উদঘাটিত।

খণ্ড কাল নয়, খণ্ড লীলা নয়।

অপূর্ব স্থির করেছে আজ সে কোর্টে যাবে না।

আজ ফুল এনেছে, মাল্য এনেছে, গন্ধদ্রব্য এনেছে। আজ অপর্ণার জন্মতিথি।

সমস্ত চাকর-বাকর মিলে ভোরের মধ্যেই সমস্ত বাড়ি ধুয়ে-মুছে ঝক ঝকে করেছে।

ভোরে উঠেই অপূর্ব স্নান করে একখানা পট্টবস্ত্র পড়েছে। তার বিবাহের জোড়। অনেক বৎসর আগে যেটা প'রে টোপর মাথায় দিয়ে একদিন সে অপর্ণাকে আনতে গিয়েছিল, হয়তো সেইটে।

কি হয়তো সেইটে নয়। অন্যটা। যেটা প'রে একদিন সে সুমিত্রাকে আনতে গিয়েছিল, সেইটেই।

অপূর্ব জানে না।

জানবার চেষ্টা না করাই ভালো। পৃথিবীতে ঘটনার পর ঘটনা এমন করে একটার উপর অন্য ছায়া ফেলে যে, কেমন গুলিয়ে যায়।

যাক্‌গে।

অপূর্ব ওসব ভাববেই না।

সে প্রকাণ্ড বড় গোড়ে-মালা পরিয়ে দিলে অপর্ণার ছবিতে। দু'পাশে দুটো ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। তার পাশে দুটো ধূপদানিতে জ্বালিয়ে দিলে অনেকগুলো ধূপকাঠি। সামনে একটা ঝক ঝকে রূপোর রেকাবীতে নানা রঙের সুগন্ধি ফুল। ধুনুচি থেকে উঠছে প্রচুর সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া। মেঝেয় দু'পাশে দুটো পিলসুজে জ্বলছে প্রদীপ।

সমনে একটা আসনে বসে অপূর্ব।

ফুলের গন্ধে নেশা লাগে। ধূপের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন। তার মধ্যে প্রদীপের আলোয় যেন একটা অদ্ভুত অনির্বচনীয় রহস্যলোকের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থাণুর মতো স্থির বসে অপূর্ব।

মুদ্রিত নেত্র। ঠোঁটে মৃদু হাসি।

সুমিত্রা ফিরেছিল গভীর রাত্রে।

তখন সমস্ত বাড়ি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কেউ জানে না তার আসার খবর। সে যে এখানে ছিল না অপূর্ব তাও জানে না।

ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে শাশুড়ীর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙল বেলায়—ফুলের গন্ধে, ধূপের গন্ধে।

বাইরে এসে অপূর্বর ঘরে উঁকি দিয়ে ছাখে, ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, প্রদীপ জ্বলছে মিটমিট করে। ফুলের মালায়, ফুলে সাজানো হয়েছে অপর্ণার ছবি।

আর তার সামনে ধ্যানস্থ অপূর্ব। মুদ্রিত নেত্র। তার কোণে জল জমেছে দুটি ফোঁটা। প্রদীপের আলোয় শিশিরের মতো জ্বলজ্বল করছে। ঠোঁটের কোণে হাসি।

সুমিত্রা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি ব্যাপার! অপূর্ব কি পাগল হয়ে গেল? যে চলে গেছে, আর আসবে না, তার জন্যে অত ফুল কেন, ধূপ-দীপ-গন্ধ কেন? অপূর্ব কি আজ কোর্টে যাবে না?

ওই দৃশ্য সে দেখতে পারলে না। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা টিপে টিপে ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেল।

ফুলের আর ধূপের সুরভি সেখানেও পৌঁছে গেছে।

সুমিত্রা বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। মনে হল সেখানেও গন্ধ আসছে।

॥ এগারো ॥

দুটো দিন বর্ধমানে যে হৈ হৈ গেছে, একরাত্রে তার ধকল কাটে না। সুমিত্রার চোখ যেন ভিতরদিকে টানছিল। কল-কাকলীর কারও দুপুরে বার হবার অবস্থা ছিল না। সুমিত্রাও খাওয়ার পরে নিদ্রা গেল।

রামধন দু'বার এসে ফিরে গেছে। তৃতীয়বার এসে দেখলে, তখন প্রায় পাঁচটা, সুমিত্রা চোখ মেলেছে বটে, কিন্তু ঘুমের জের কাটেনি। চোখ রক্তবর্ণ।

—আপনার চা আনি মা?

—চা? ক'টা এখন?

—পাঁচটা বাজে।

—কি সর্বনাশ! পাঁচটা! চা নিয়ে আয়।

সুমিত্রা মুখ ধুয়ে আসতেই রামধন চা নিয়ে এল।

—বাবু কোথায় রে?

প্রশ্নটা শুধু রামধনের কানে নয়, সুমিত্রার নিজের কানেও আশ্চর্য শোনাল। বাবুর কথা বহুকাল সে জিজ্ঞাসা করেনি।

প্রথম চমকটা কাটিয়ে রামধন বললে, তিনি তাঁর ঘরে শুয়ে।

—ঘুমুচ্ছেন?

—না। জেগেই আছেন।

—চা খেয়েছেন?

—অনেকক্ষণ।

সুমিত্রা আর কিছু বললে না। আপন মনে কি যেন ভাবতে লাগল।

রামধন চলে যেতে, চায়ের কাপটা হাতে নিয়েই অপূর্বর ঘরে গেল। তার দিকে পিছন করে অপূর্ব জানালার বাইরে চেয়ে ছিল।

খাটের কাছে একটা চেয়ার সশব্দে টেনে এনে সুমিত্রা বসল।

চেয়ার টানার শব্দে অপূর্ব পাশ ফিরলে। এবং সামনে সুমিত্রাকে দেখে চমকে উঠলে।

সেটা সুমিত্রার দৃষ্টি এড়াল না। জিজ্ঞাসা করলে, চমকালে যে!

—হুঁ।

—চমকালে কেন?

—বোধ হয় তোমাকে দেখবার জন্যে মন প্রস্তুত ছিল না।

—অনেকদিন পরে দেখা হল, অনেকদিন পরে এ-ঘরে এলাম, তাই?

—বোধ হয়!

—কেন এ-ঘরে আসিনি জানতে চাইলে না তো?

—না।

—জানতে চাও না?

—না। কি হবে জেনে?

—তার মানে—আমি এ-ঘরে আসি তা তুমি চাও না।

অপূর্ব স্থিরদৃষ্টিতে মুহূর্তকয়েক ওর দিকে চেয়ে রইল।

অপূর্ব শান্তকণ্ঠে বললে, এ-ঘরে অথবা অন্য কোনো ঘরে যাওয়া না-যাওয়া তোমার ইচ্ছা। সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

—কেন নেই?

—তা জানি না।

সুমিত্রা ভ্রূ কুঞ্চিত করলে। অপূর্ব তার দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু সে-দৃষ্টিতে যেন রং নেই। কেমন আলস্য-জড়িত দৃষ্টি।

জিজ্ঞাসা করলে, সকালে কি করছিলে?

—কবে?

—আজ সকালে। আসনের উপর বসে? যোগসাধনা করছ।

—যোগসাধনা? তা বলতে পার।

—কোর্টে যাওনি?

—না।

—যোগসাধনা করবার জন্যে?

—তাও বলতে পার।

সুমিত্রা খিলখিল করে হেসে উঠল: যোগসাধনাই বটে! কিন্তু ছবিটা মহামায়ার বলে মনে হচ্ছে না তো?

কার মনে হচ্ছে?

অপূর্বর ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

নিস্পৃতভাবে সুমিত্রা বললে, কি করে বলব? আমার দেখা কোনো মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না।

ব'লেই প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দেবার জন্যে তৎক্ষণাৎ বললে, বর্ধমান গিয়েছিলাম।

—কবে ?

বিস্মিতভাবে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি জান না ?

—না।

সুমিত্রা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই বাড়ির গৃহিণী সে। দু'দিন বাড়ি নেই। কর্তা জানেনই না !

—তাহলে আর তোমাকে বলে লাভ নেই।

ব'লে বেরিয়ে চলে গেল।

অপূর্ব আবার পাশ ফিরে শুল।

কিন্তু বাহিরেও সুমিত্রা বেশিক্ষণ থাকতে পারলে না। আবার ফিরে এল। ছবিটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

জিজ্ঞাসা করলে, কার ছবি বল তো ?

—তোমার দেখা মেয়ে নয় !

—তা তো জানি। কিন্তু কার ? ছাখো ছাখো, সকালে যে-মালা পরিয়েছিলে, বিকেলেই তা শুকিয়ে গেছে।

অপূর্ব হাসলে : পৃথিবীর ধর্মই তাই। এখানে কিছুই স্থায়ী নয়, কিছুই স্থির নয়। সবই শুকিয়ে যায়, হারিয়ে যায়। কিছুই ধরে রাখা যায় না।

সুমিত্রা বললে, এখানে

"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই।
যাহা পাই তাহা চাই না।"

অপূর্ব বললে, ঠিক বলেছ। 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই'। আর ছাখো, এখানে চাইবার আছেই বা কি ?

—কেন সবই আছে। রূপ, যৌবন, ধন, ঐশ্বর্য্য,—কি নেই ?

অপূর্ব হাসলে : ধরে রাখা যায় ? নিয়ে যাওয়া যায় ? 'হায়

রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়'। ফেলে যেতে হয়, নিয়ে যাওয়া যায় না।

অপূর্ব আবার হাসলে।

—সুমিত্রা, তুমি বর্ধমান গিয়েছিলে? আমি জানি না। কবে গিয়েছিলে?

—একদিন গিয়েছিলাম।

—কবে ফিরলে?

—আর এক দিন।

—বেশ।

অপূর্ব আবার বললে, পৃথিবীটা কেবলই ঘুরছে। সেখানে চুপ করে বসে থাকলেই যখন ঘোরা যায়, তখন আবার ঘোরা কেন?

হেসে বললে, আমার একটি বন্ধু রেলগাড়িতে উঠে অনবরত পায়চারি করত। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত, পায়চারি করছিস কেন? সে বলত, গাড়িটা একাই চলবে? আমিও একটু চলি। গাড়িটাকে সাহায্য করাও হবে, দু'পা এগিয়ে থাকাও হবে।

সুমিত্রা বললে, কিন্তু শাস্ত্রে নাকি বলে, 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'। গতিই জীবন।

—তাহলে তো এরোপ্লেনকে সবচেয়ে জীবন্ত বলতে হয়। আর মানুষের মধ্যে ধরলে রিক্সাওলার চেয়ে বেশি চলে কে? কিন্তু তাকে তোমরা মানুষের মধ্যেই ধরতে চাওনা।

—তাহলে শাস্ত্রের কথা কি মিথ্যে বলতে চাও?

—আমি কিছুই বলতে চাইনে। কিন্তু চলাও তো অনেক রকমের আছে।

—যত রকমেরই থাক্, না-চলে চলা বলে কিছু আছে?

—আছে বইকি। তুমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে মথুরা চলে যেতে পার। নড়তে হল না অথচ চললে।

সুমিত্রা হেসে বললে, একটি পয়সাও খরচ হল না। তুমি কি সেই চলা অভ্যেস করেছ?

—কতকটা। দেখি, পারি কিনা?

—কেন? শুয়ে থাকা কি খুব কঠিন?

—অত্যন্ত ঘোরার চেয়ে অনেক বেশি। বিশ্বাস না হয়, ক'দিন শুয়ে থেকে পরীক্ষা করে দেখতে পার।

সুমিত্রা হেসে বললে, রক্ষে কর! একদিন শুয়ে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।

—তবে?

—কিন্তু তুমি কি আরম্ভ করেছ?—সুমিত্রা এতক্ষণে কাজের কথায় এল,—কোর্ট কামাই করে ধূপ-ধুনো, পূজো-পার্বণ?

—তাতে ক্ষতি কি হল?

—কোর্ট কামাই।

—কোর্ট আর যাব না। হাতে যে ক'টা মামলা আছে, সেগুলো চুকে গেলেই ওকালতি ছেড়ে দোব।

—দিয়ে দিনরাত্রি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে?

—হ্যাঁ।

সুমিত্রা বিরক্তভাবে বললে, এ কি পাগলামি তোমাকে পেয়ে বসল?

শান্তকণ্ঠে অপূর্ব বললে, পাগলামি নয়।

—তা ছাড়া আর কিছুই নয়! তুমি হয়তো সন্দেহ করবে, এ ঈর্ষা। কিন্তু তা নয়। মরা মানুষের ওপর কেউ ঈর্ষা করে না। তা ছাড়া তোমাকে বলি; স্ত্রীলোক-ঘটিত ছোটো-খাটো ঈর্ষা আমাকে স্পর্শ করে না। ওর থেকে কি পাও তুমি?

—আনন্দ।

—আনন্দ! ওই মৃতা মহিলার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তুমি আনন্দ পাও?

—মৃতা মহিলা নয় !

—ও তো তোমার প্রথমা স্ত্রীর ছবি। তিনি কি মারা যাননি ?

—না।

তবে কোথায় তিনি ?

ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে তেমনি শান্তকণ্ঠে অপূর্ব বললে, ওই তো।

—ও তো ছবি।

—ওই অপর্ণা। সুমিত্রা, মানুষ মরে না।

—মরে না ! কি হয় তবে ?

—দেহটা ছেড়ে শুধু এ-ঘর থেকে ও-ঘরে চলে যায়। আবার তাকে পাওয়া যায়।

অপূর্বর দৃষ্টি প্রত্যয়ে দৃঢ়। সে-দৃষ্টির সামনে সুমিত্রার কেমন ভয় করছিল।

জিজ্ঞাসা করলে, তুমি পেয়েছ ?

অপূর্বর সমস্ত মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেও একটা আশ্চর্য হাসি।

বললে, না পেলে আর আনন্দ কিসের ! সুমিত্রা, অপর্ণাকে আমি পেয়েছি।

সুমিত্রা বিমূঢ় বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অপূর্ব ধীরে ধীরে উঠে বসল। ছবির দিকে একবার আড়-চোখে চাইলে। একটু হাসলে।

বললে, তোমাকে যেমন করে পেয়েছিলাম, এমন কি অপর্ণাকেও যেমন করে পেয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে, অনেক নিবিড় করে। এ আনন্দের তুলনা নেই।

অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মতো চেয়ে সুমিত্রা বললে, কিন্তু পাওয়াটা কি ? তাঁর তো দেহ নেই।

—না।

—কথাও বলে না।

—বলে। তোমাকে তো বললাম সুমিত্রা, কথা আমাদের চব্বিশ ঘণ্টাই চলে। যেমন করে তুমি এসে বসেছ, এমনি করেই এসে বসে। কথা সে বরাবরই বেশি বলত না। এখনও বলে না। অল্প কথা বলে, অত্যন্ত মিষ্টি কথা। আর সকল সময় ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি। তোমাকে বলব কি, আমার দেহে-মনে একটা আনন্দপ্রবাহ বয়ে যায়।

সুমিত্রা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অপূর্বর দিকে চাইলে।

অপূর্ব কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

জিজ্ঞাসা করলে, তাঁকে দেখতে পাও?

—পাই। ঠিক যেমন করে তোমাকে দেখছি, এমন করে কিন্তু নয়?

—তবে?

অপূর্ব কী একটু ভাবলে। বোধ হয় কেমন করে ব্যাপারটা বোঝাবে তার ভাষা পাচ্ছিল না।

তারপর বললে, কেমন জান? স্বপ্নে যেমন করে দেখা যায় তেমনি।

—কী কথা বলেন?

অপূর্ব হাসলে। পাগলের মতো স্বচ্ছ সুন্দর হাসি।

বললে, কথা কিছুই নয়, সুমিত্রা। কথা হল মানুষটি নিজে। চেহারা যেমন একদিক দিয়ে মানুষটিকে প্রকাশ করে, কথা অন্যদিক দিয়ে। কী কথা বললে সেটা বড় নয়, কে .কথা বললে সেইটেই বড়, সেইটেই আসল। অপর্ণা কথা বলে।

সুমিত্রার চোখে বিস্ময়।

অপূর্ব বলে চলল: ওর কথা আমি শুনি না সুমিত্রা, দেখি।

—দ্যাখো? কথা দ্যাখো?

—হ্যাঁ, দেখি, কথার মিছিল। ওর উদ্ভিন্ন বিম্বাধরের ফাঁক

দিয়ে একটির পর একটি বাক্য যেন মিছিল করে বেরিয়ে আসছে কত রং! কত শোভা!

—হুঁ।

সুমিত্রা উঠল। চিন্তিতভাবেই উঠল।

উঠতে উঠতে বললে, তুমি কি কোথাও বেরুবে?

—না।

—তুমি কি কোথাও বেরোও না?

··না।

···একটু বাইরে বেড়িয়ে এসো-না। মনটা ভালো হবে।

···না।

অপূর্ব আবার পাশফিরে শুল।

॥ বারো ॥

বর্ধমানের বিবরণ সকালের কাগজেই ফলাও করে বেরিয়েছিল। ক্লাবে এসে ছ্যাখে, সিনেমা-পত্রিকার পক্ষ থেকে দুটি ভদ্রলোক সুমিত্রার জন্য অপেক্ষা করছে।

চা চলছে। সিগারেট চলছে। কলকাকলীর ছেলে-মেয়েরা তাদের ঘিরে বসে আছে।

সুমিত্রা ঘরে ঢুকতেই তারা উঠে দাঁড়াল। একটি মেয়ে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলে।

অপূর্বকে দেখে তার ভালো লাগছে না। মনটা ভারী হয়েই রয়েছে। কিন্তু সিনেমা-পত্রিকার রিপোর্টারদের দেখে মনের ভার অনেকখানি লঘু হয়ে গেল। মুখে চোখে স্ফূর্তি ফিরে এল।

ওরা বললে, আপনার একখানা সচিত্র জীবন আমাদের কাগজের সামনের সংখ্যায় ছাপতে চাই।

এতখানির জন্যে সুমিত্রা প্রস্তুত ছিল না।

বললে, আমার জীবনী ! আমার জীবনে এমন কী ঘটেছে যা ছাপা হবার যোগ্য ?

রিপোর্টার মিষ্টি হেসে বললে, নিজের সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা ওই রকম। কিন্তু ছবিতে, লেখায় যে জীবনী আমরা লিখি, সে একটা সৃষ্টি। আপনার সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল অনন্ত। বলতে গেলে, যা-কিছু কৌতূহল আপনাদের নিয়েই। সেই কৌতূহল মেটাবার ভার নিয়েছি আমরা। বড় সহজ দায়িত্ব তো নয় !

সুমিত্রা লজ্জা পাচ্ছিল। বললে, ছবি তো আমার নেই।

...থাকলেও নিতাম না। আমরা আমাদের কাগজের জন্য বিশেষ ছবি তুলি। ইনি আমাদের ফটোগ্রাফার। তাতে আপনার নিজের হাতে নাম-সই থাকবে।

সুমিত্রা বললে, আচ্ছা, ও ঝামেলা মিটল। এখন কি বলব বলুন বলবার আছেই বা আর কি ? গেরস্ত-ঘরের মেয়ে। লেখাপড়া কিছু করেছিলাম কিন্তু শিশুকাল থেকেই মন আমার নাচের দিকে। গেরস্ত-ঘরের বধূ হয়েও এটা ছাড়তে পারিনি। এই তো জীবন !

রিপোর্টার বললে, এ কি খুব সাধারণ জীবন মনে করেন ? আচ্ছা আপনার জীবনের দু'একটি অসাধারণ ঘটনার কথা বলুন।

একটু চিন্তা করে সুমিত্রা বললে, অতিরিক্ত কিছু মনে পড়ছেনা।

...ঠিক আছে। ও আমরা বানিয়ে নোব এখন। আচ্ছা, আপনার বাল্যজীবনের পরিবেশের কথা কিছু বলুন।

...পরিবেশ।... সুমিত্রা হাসলে,...কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত বাঙালী-ঘরের যে সাধারণ পরিবেশ। তার অতিরিক্ত কিছু মনে পড়ছে না।

...ঠিক আছে। আপনার বাড়িতে নাচ-গানের কোনো পরিবেশ ছিল না ?

...মোটেই না। বাবা পাটের বাজারে দালালী করেন।

মায়ের বাবা ছিলেন দাঁতের ডাক্তার। এর মধ্যে কারুকলার স্থান কোথায় ?

...এই অবস্থায় নাচের দলে এলেন কি করে ?

...এলাম নয়, এসে পড়লাম। আমাদের পাড়ায় একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আমাদের একটি আত্মীয় ছিলেন অনুষ্ঠানের পাণ্ডাদের একজন। পাড়ার আরও পাঁচটি কিশোরী মেয়ের সঙ্গে তিনি আমাকেও টানলেন তাঁর অনুষ্ঠানে। তারপরে আর একটি অনুষ্ঠানে, তারপরে আর-একটিতে। এমনি করে কি করে যে এসে গেলাম মনে পড়ে না।

রিপোর্টার হেসে বললেন, এইতো অনেক মাল-মসলা এসে যাচ্ছে। তারপরে ?

...তারপরে পাল-টাঙানো ষ্টেজ থেকে কাছাকাছি হল্-এ, সেখান থেকে আরও বড় হল্-এ, তারপরে আরও বড় হল্ এ। কেন, কি করে এই ক্রমোন্নতি তার কারণ বলতে পারব না।

রিপোর্টার টুকরো টুকরো 'নোট' নিচ্ছিল।

বললে, কিছু দরকার নেই। এ সমস্তই আমার জানা। কিন্তু যখন লেখাটা বেরুবে, দেখবেন এমন অনেক কথা আছে যা আপনিও জানতেন না।

সবাই হাসতে লাগল।

তার পরে একে একে সবাই চলে গেল, কুণাল বাদে, যে ছেলেটি বেহালা বাজায়।

সে এসে ধীরে ধীরে সুমিত্রার পাশে বসলে।

বললে, সুমিত্রাদি, এবারে তুমি বিখ্যাত হলে। আর রক্ষে নেই।

—রক্ষে নেই কেন ?

—ওরে বাবা, বাংলাদেশে মেয়েরা বিখ্যাত হলে আর তাদের রক্ষে নেই। আমি অবশ্য তরুণী মেয়েদের কথা বলছি।

—কেন ?

—সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, দলে দলে তরুণ ছেলের দল আসবে। কেউ অটোগ্রাফ নিতে, কেউ-বা দুটো অবান্তর আলোচনা করতে। বিখ্যাত হওয়ার অনেক ঝঞ্ঝাট।

ঠোঁট উল্‌টে সুমিত্রা বললে, তার আর ঝঞ্ঝাট কি ? আসবে, আসবে। একটা অটোগ্রাফ দিতে, কি দুটো অবান্তর কথা বলতে আর এমন কি পরিশ্রম !

কুণাল বললে, এখন বলছ বটে, কিন্তু দু'দিন পরে বলবে, আর তো বাঁচিনে ! বাংলাদেশের এই শ্রেণীর ছেলেরা মাছির মতো। কামড়ায় না, কিন্তু জ্বালাতন করে।

ভ্রূ বেঁকিয়ে আড়চোখে ওর দিকে চেয়ে সুমিত্রা বললে, তোমার হিংসে হচ্ছে, না ?

কুণাল হেসে বললে, অন্তরাল থেকে অমন চমৎকার যে বেহালা বাজাই, অন্তরালেই রয়ে গেলাম। হিংসে হওয়াই তো স্বাভাবিক সুমিত্রাদি। কিন্তু জান, ওই ভদ্রলোকদের ডেকে আনলে কে ?

—কে ? তুমি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওদের দু'জনকে আর সেই সঙ্গে ওদের সম্পাদককেও দু'দিন হোটেলে চা খাওয়াতে হয়েছে খবর রাখ ?

—তুমি খাইয়েছ ?

—আর কে খাওয়াবে ? ওদের যাওয়া-আসার ট্যাক্সি-ভাড়াও আমাকে দিতে হল।

সুমিত্রার ধারণা হয়েছিল ওরা যেচে এসেছে তার কাছে। কুণালের কথায় সেই বুদ্‌বুদটা ফেটে যাওয়ায়, ভিতরে ভিতরে একটু ক্ষুণ্ণ হল।

সে তাড়াতাড়ি ভ্যানিটি-ব্যাগটা খুলতে খুলতে বললে, কত খরচ হয়েছে বল। আমি দিয়ে দিচ্ছি।

কুণাল খপ করে ওর হাত চেপে ধরে বাধা দিলে। বললে, করুণাময়ী, তোমার করুণার ভ্যানিটি-ব্যাগটা বন্ধ কর। খ্যাতি অর্জনের যেটা রাজপথ,—যে পথে আমাদের আগেও বহু লোক গেছে, পরেও যাবে,—সেই পথেই আমি চলেছি। এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই, দুঃখেরও না। খ্যাতির ওপর তোমার লোভ না থাকতে পারে, কিন্তু ওর একটা ব্যবসায়িক মূল্য আছে। দলের সেক্রেটারি হিসাবে সেদিকে আমার তো একটা কর্তব্য আছে। তুমি মানে তো শুধু তুমি নও, কল-কাকলী।

ফিক করে হেসে সুমিত্রা বললে, খ্যাতিতে আমারও লোভ আছে।

—থাকা স্বাভাবিক। ভ্যাখো, নাচ বল, গান বল, কাব্য-শিল্প-সাহিত্য বল, খুব কম লোকেই সে-সমস্ত বোঝে। যাঁরা বোঝেন, এদেশে তাঁরা চুপ করে থাকেন। অবশিষ্ট জনতা শুধু কাগজের মন্তব্য পড়ে ভালো-মন্দ নির্ণয় করে।

কুণাল হাসতে লাগল।

তারপর বললে, কিন্তু খ্যাতির ওই একটাই দিক নয়। ওর বিড়ম্বনাও আছে। সেদিকেও সতর্ক করে দিলাম।

—ওই অটোগ্রাফ আর অবান্তর আলোচনা?

—আরও আছে। তা ক্রমশ জানতে পারবে।

ওর কোলে মাথা রেখে সুমিত্রা সটান শুয়ে পড়ে বললে, যাক। আমি খ্যাতি চাই। খ্যাতির মদ আমি আকণ্ঠ পান করতে চাই। কুণাল!

—বল।

—আজ দুপুরে যদি বাড়ি না ফিরি?

—দরকার কি ফিরে?
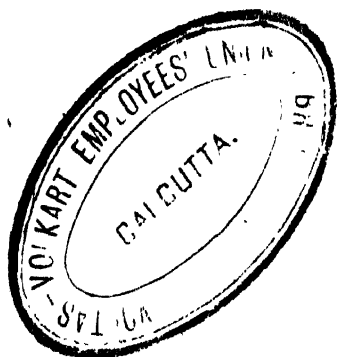
—বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা করছে না। বাড়িটা কিরকম যেন হয়ে গেছে!

—কিরকম হয়ে গেল?

—ভূতুড়ে বাড়ির মতো।

কুণাল চমকে উঠল : সে আবার কি! উৎপাত করে নাকি? ঢিল ছোঁড়ে? নাকী সুরে কথা কয়?

সুমিত্রা হেসে ফেললে: না, না। সেরকম কিছু নয়। আচ্ছা কুণাল, মরা মানুষ কি আবার ফিরে আসে? দেখা দেয়? কথা বলে?

—শুনেছি, বলে।

—তোমার কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে?

—কিছুমাত্র না।

সুমিত্রা ভেবে বললে, আমার ধারণা ওসব বাজে কথা।

—তাই হবে।

আবার একটু ভেবে সুমিত্রা বললে, কিন্তু আমার স্বামী কি আরম্ভ করেছেন জান?

—কি? প্ল্যাঞ্চেট?

—তাঁর প্রথম স্ত্রীর ছবির সামনে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকেন।

—হঠাৎ?

—কি জানি। কিছুদিন থেকে এইসব আরম্ভ করেছেন। বলছেন, মৃত ভদ্রমহিলা তাঁর কাছে চেয়ারে এসে বসেন, গল্প করেন, হাসেন। বলেন, সে-সময় তাঁর শরীরে নাকি একটা আনন্দ-প্রবাহ বয়ে যায়।

সুমিত্রা খিলখিল করে হেসে উঠল।

কুণাল সভয়ে বললে, ওরকম করে হেস না। শুনতে শুনতে আমারও হাড়ের ভিতর কী যেন শির শির করে বয়ে যাচ্ছে! ছাখো, গায়ে কাঁটা দিয়েছে!

সুমিত্রা ওর গালে একটা চড় মারলে। বললে, তুমি খুব ভীতু, না ?

কুণাল স্বীকার করলে, ভূতের সম্বন্ধে তার একটু ভয় আছে। জিজ্ঞাসা করলে, ওই বাড়িতে তুমি আছ কি করে ?

—থাকব না তো কোথায় যাব ? অতগুলো লোক রয়েছে, ভয়ই বা কি !

কুণাল বললে, দিনের বেলা, তুমি রয়েছ, গল্প শুনতে-শুনতে তবু তো আমার গা-ছমছম করছে।

—তাহলে তুমি বাড়ি যাও বরং।

—সেই ভালো। সন্ধ্যেবেলা আসছ তো ?

সুমিত্রা হেসে বললে, আমি তো আসব। কিন্তু তোমার গা-ছমছম করবে না তো ?

—না, সবাই থাকলে আর ভয় কি ? তেমন ভীতু আমি নই !

—না-হলেই ভালো। চল, বরং তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাই।

—সেই ভালো।

ওরা দু'জনে উঠল।

॥ তেরো ॥

সিনেমা-পত্রিকাখানিতে যে বিবরণ প্রকাশিত হল, তার সঙ্গে সুমিত্রার বাস্তব জীবনের মিল শুধু এইটুকু যে, শিশুকাল থেকেই নৃত্যে তার অনুরাগ ছিল। এ ছাড়া আর যা কিছু, তার সঙ্গে ওর জীবনের অল্পই মিল আছে।

পত্রিকাখানি হাতে করে সুমিত্রা ছুটে এল ক্লাবে :

কুণাল ! কুণাল !

কুণালও তখন সেই পত্রিকার সেই সেই পৃষ্ঠাটাই পড়ছিল, এই তৃতীয় বার।

সুমিত্রাকে দেখেই সে চীৎকার করে উঠল: চমৎকার লিখেছে, না?

—হ্যাঁ। কিন্তু ওটা আমি নই।

—কি করে জানলে তুমি নও?

—কারণ আমার জীবনের সঙ্গে মিলছে না।

—কী মিলছে না? তুমি নাচতে পার এটা মিলছে না?

—ওটা মিলছে।

—তুমি ভালো নাচতে পার এটা মিলছে না?

—কিছু কিছু মিলছে।

পত্রিকাখানা সশব্দে সামনের টিপয়ের উপর রেখে কুণাল বললে, তাহলে আর মিলতে বাকি রইল কি? ওইতো তোমার পরিচয়।

—কিন্তু এইগুলো: আমি স্বপ্নে নাচের অদ্ভুত ভঙ্গী দেখতাম। তখনই উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই ভঙ্গীটি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করতাম। মানুষের জীবন বিভিন্ন ছন্দের সমষ্টি—এ তত্ত্ব নাকি পনের-বছর বয়সের সময়ই আমার অধিগত হয়েছিল। এসব কার কথা?

—তোমারই। ও হল আমাদের চোখে তুমি যা, তাই। আমরা প্রত্যেকেই অন্যকে কল্পনা মিশিয়ে জানি।

—সেই কি আসল জানা?

—তা ছাড়া জানবার অন্য পদ্ধতি নেই। ফোটোগ্রাফের সঙ্গে শিল্পীর আঁকা ছবি মেলে না অথচ সবাই জানে, শিল্পীর আঁকা ছবিটাই বড়।

সুমিত্রা হেসে বললে, অর্থাৎ আসলের চেয়ে নকল বড়।

—তুমি আসল-নকল ভাবছ কেন? যে বর্ণনার মধ্যে তোমার চরিত্র যথার্থ ফুটে উঠবে, সেইটেই তোমার আসল বর্ণনা। তোমার

এই ছবিটাই ছাখো। কী চমৎকার ভঙ্গীতে তোলা হয়েছে বল তো? এর মধ্যে তোমার চরিত্র নিহিত রয়েছে।

—চরিত্র না ছাই! চাইতে লজ্জা করে?

কুণাল হেসে ফেললে : লজ্জার কি আছে? রূপের মধ্যে লজ্জা কিসের?

সুমিত্রাও বললে, না। লজ্জা কিসের? বাইরের চোখে আমি কী, জানা হল, ভালোই হল।

তারপর বললে, চল কুণাল, একবার ভারতবর্ষটা ঘুরে আসি।

—যাব। অন্যের পয়সায় সদলে দেখে আসব। সেই ব্যবস্থাই করছি।

—তোমার কি ধারণা বাংলাদেশের বাইরে থেকেও আমাদের ডাক আসবে?

—আসবে না? তুমি তৈরি থাক, সুমিত্রাদি; এখন আমাদের ডাকের পর ডাক আসবে। আমি কি ভাবছি জান?

—কি?

—আমরা পেশাদার হয়ে যাব। সৌখীন দলের দৌড় সীমাবদ্ধ। নাচের-মঞ্চে যদি চিহ্ন রেখে যেতে হয়, তাহলে পেশাদার হতে হবে।

সুমিত্রার মনে দ্বিধা আছে।

বললে, সে কি ঠিক হবে?

—কেন হবে না? তোমার সমস্ত সময় নিয়োগ করতে না পারলে কিছুই হবে না। আর সমস্ত সময় নিয়োগ করতে গেলে পেশাদার হতেই হবে। সত্যিকথা বলতে কি, 'কল-কাকলী'র সব সদস্যের অবস্থা তো সচ্ছল নয়।

কথাটা সত্যি।

সেদিনের মতো এই পর্যন্তই কথা হল।

ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন।

চা-বাগানের লোক। চাল-চলন দেখে বোঝা যায় পয়সার সচ্ছলতা আছে। তাঁদের যখন ক্লাবে অনেক পয়সা জমে যায় তখন কোনো একটা উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন হয়। কর্মোপলক্ষ্যে যাঁরা থাকেন, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁদের থাকেনা বললেই হয়। এই উপলক্ষ্যে বাইরে থেকে বক্তা আসেন, নৃত-গীতের শিল্পীরা আসেন। দিনকয়েক ধূমধাম চলে। কর্মজীবনের মধ্যে একটা সামাজিক জীবনের আবির্ভাব হয়।

বস্তুত সমস্ত লোক বৎসরের এই ক'টি দিনের জন্য, বলতে গেলে, প্রতীক্ষা করে থাকে।

'কল-কাকলী'র খবর তাঁরা পেয়েছেন সিনেমা-পত্রিকায়। বিবরণ পড়ে সকলের মতো তাঁরাও মুগ্ধ হয়ে গেছেন। আর অর্থের যখন অসুবিধা নেই তখন স্থির করেছেন এই দলটিকেই নিয়ে যেতে হবে। যত টাকা লাগে।

কুণাল সুমিত্রাকে চেনে। টাকা-পয়সা সম্পর্কে সে অত্যন্ত লাজুক।

বললে, সুমিত্রাদি, তুমি চুপ করে থাকবে। কথা আমি বলব।

সুমিত্রা বললে, বেশ।

সে বেঁচে গেল।

কুণাল তাদের পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলে। কিন্তু গরজ দেখালে না।

বললে, দেখুন, ঠিক পেশাদার যাকে বলে, আমরা তা নই! এতদিন পর্যন্ত যা-কিছু অনুষ্ঠান করেছি কলকাতাতেই। প্রথম বর্ধমান গেলাম। গিয়ে বিপন্ন। এখন নানা জায়গা থেকে ডাক আসছে। কি যে করি!

কুণাল চিন্তা করতে লাগল।

—আপনাদের ক'দিনের অনুষ্ঠান?

—তিন দিনের।

—আর অন্য কোনো দল যাচ্ছে ?

—আমাদের ইচ্ছে, যদি অসুবিধা না হয়, তাহলে তিন দিনই আপনাদের অভিনয় হবে।

কুণাল মনে মনে খুশি হল। একদিনের জন্যে অতদূর যাওয়া যায় না।

জিজ্ঞাসা করলে, যাব কিসে ?

—আমরা প্লেনের ব্যবস্থা করব। যাওয়া-আসা দুই-ই।

—থাকবার কি ব্যবস্থা করবেন ? আমাদের দলে অত্যন্ত অভিজাত ঘরের ছেলেমেয়েরা আছে !

ভদ্রলোক বললেন, একটা চমৎকার বাংলো আপনাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। খাওয়া-শোয়ার কোন অসুবিধা হবে না, কথা দিচ্ছি।

এবারে দক্ষিণার প্রসঙ্গ।

কুণাল বললে, দেখুন, আমরা প্রতি রাত্রি হাজার টাকা নিয়ে থাকি। কিন্তু আপনারা যখন একসঙ্গে তিন রাত্রির বায়না করছেন তখন আড়াই হাজার টাকা দেবেন।

ভদ্রলোক দুজন পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

কাঁচুমাচু করে বললেন, বড় বেশি হচ্ছে। আমাদের সামর্থ্য খুব বেশি নয়। একটু বিবেচনা করুন।

—আর কি বিবেচনা করব বলুন। পাঁচশো টাকা তো করলাম।

ব্যবসায়ী মানুষ। দর কষাকষি না করে পারেন না। অনেকক্ষণ ধরে তাই হল। তাঁরা বললেন দু'হাজার। কুণাল টানাটানি করে আরও একশো টাকা ছেড়ে দিতে রাজি হল। ওঁরা আর একটু উঠলেন। কুণাল আর নামতে রাজি হল না। অবশেষে তেইশ শো টাকায় রফা হল।

কুণাল বললে, দেড় হাজার টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে দিলে চুক্তি

পাকা হবে। তারপর আমাদের লোক যাবে। দেখে আসবে থাকা-খাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়েছে কিনা। তার টেলিগ্রাম পেলে তবে আমরা রওনা হব।

তাতে ভদ্রলোকদের আপত্তি নেই।

বললেন, আমরা এখনই টেলিগ্রাম করে দোব। কাল-পরশুর মধ্যে টাকা এসে যাবে। চুক্তি শেষ করে আপনাদের লোককে নিয়ে আমরা চলে যাব। তাঁর টেলিগ্রাম পেলেই আপনারা প্লেন বুককরবেন।

তাই স্থির হল।

ওঁরা চলে গেলে কুণাল গর্বিত দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে চাইলে।

—পারতে?

সুমিত্রা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করলে, না। আলু-পটলের মতো দর আমি করতে পারতাম না।

—সেইজন্যেই তোমাকে চুপ করে থাকতে বলেছিলাম।

অন্য সকলের দিকে চেয়ে কুণাল সগর্বে জিজ্ঞাসা করলে, কি হে, কেমন হল?

—ভালো। চমৎকার।

—এর পরেই আসছে কানপুর। তার মানে জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা ফিরেই কানপুর যেতে হবে। তারপরে আবার কে আসে ছাখো। ঘোরাঘুরিই চলল এখন।

মিহির বললে, অত ছুটি কি পাব? অফিস যা কড়াকড়ি আরম্ভ করেছে!

কুণাল হেসে বললে, অফিসে আর বেশিদিন চাকরী করতে হবে না হে। এইভাবে যদি আর কিছুদিন চলে তাহলে

অফিসে যা পাও তার চেয়ে অনেক বেশি এখান থেকেই পেতে পারবে।

মিহিররা উল্লাসে নেচে উঠল: বাঁচা যায় মাইরি। অফিস যেতে আর ভালো লাগে না। মন চব্বিশ ঘণ্টা এখানেই পড়ে থাকে। মাইরি বলছি।

কিন্তু সুমিত্রাকে যেন চিন্তিত বোধ হল।

কুণাল তা লক্ষ্য করলে। জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছ?

সুমিত্রা হাসলে। উত্তর দিলে, ভাবছি কোথায় যাচ্ছি!

—কেথায় যাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে?

জানি না। বুঝতে পারছি না।

কুণাল বললে, আমি পারছি। চলেছি খ্যাতির পথে। অর্থ-সৌভাগ্যের পথে। সুমিত্রাদি, থেম না।

—না। থামবার উপায় রাখছ কই? জলপাইগুড়ি, সেখানে থেকে ফিরেই কানপুর। তারপরে আবার হয়তো অন্য কোথাও।

—হ্যাঁ। আরও অনেক জায়গায়। তুমি একদিন ভারত-ভ্রমণের ইচ্ছা জানিয়েছিলে, সুমিত্রাদি। এবার ভারত-ভ্রমণের জন্যে প্রস্তুত হও।

—ব্যাপার সেইরকমই দেখছি।

ব'লে সকলের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের সকলেরই কি ইচ্ছা আমরা পূরোদস্তুর পেশাদার হয়ে যাই?

ছেলেদের সকলেরই সেই ইচ্ছা। মেয়েদেরও অনেকের।

কেউ কেউ বলেন, বাড়িতে একবার জিগ্যেস করা দরকার।

কুণাল বললে, জিগ্যেস করে নাও। আমরা একটা চৌমাথার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি। জীবনের পথ বেছে নেবার সময় এল স্থির করে নাও, কে কোন্ পথে যাবে।

কথাটা সে এমন গম্ভীরভাবে বললে যে, সবাই চমকে গেল। জীবনের পথ আবার কি? ক'জন নৃত্যগীতানুরাগী ছেলেমেয়ে একটু

আনন্দ করবার জন্যে এখানে এসে জুটেছে। কখনও অনুষ্ঠান করে, অবশিষ্ট সময় রিহার্সালের নামে হৈ-হুল্লোড় করে। অনেকেই সচ্ছল ঘরের ছেলে মেয়ে। অন্নচিন্তা নেই। অন্তত বাপ-মা থাকতে নয়। হঠাৎ তাদের জীবনের পথ বেছে নেবার কথা বললে—চমক একটু লাগেই।

তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগল।

জীবনের কথা তারা ভাবেনি। জীবিকার কথাও না। শুধু আনন্দের কথা ভেবেই এখানে এসে জমেছে।

এখন কুণাল বলে কি?

কুণাল বলে, সৌখিন দল নতুন পথ দেখাতে পারে। কিন্তু স্থায়ী কিছু করতে পারে না। তার জন্যে দরকার সমস্ত সময়, চিন্তা, ধ্যান-ধারণা নিয়োগ করতে পারে এমন পেশাদার।

'কল-কাকলী' এখন থেকে পেশাদার দলে পরিণিত হল। কাল জলপাইগুড়ি যাবে, পরশু কানপুর। সমস্ত ভারতের রসিকজনকে তারা নাচ দেখিয়ে বেড়াবে, আনন্দ পরিবেশন করবে। এই তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা।

নাচ দেখাতে কারও আপত্তি নেই। আনন্দ পরিবেশনে তো নয়ই। এমন কি, সমস্ত সময় নিয়োগেও তারা প্রস্তুত। তা তো করছেই। আপত্তি হচ্ছে, এটাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে।

সকলের বাপ-মা কি এতে সম্মতি দেবেন?

যদি না দেন, তাহলে কি তাদের দল ছেড়ে দিতে হবে?

না। কুণাল বললে, তারাও থাকবে। কলকাতায় কোন অনুষ্ঠান হলে তারা নামবে। কিন্তু বাইরে যাবার জন্যে তাদের পেশাদার অন্য ছেলেমেয়ে নিতে হবে।

—সুমিত্রাদি, তুমি কি বল?

সুমিত্রা কোনা উত্তর দিতে পারলে না। তার আশঙ্কা হল দলে কিছু পরিবর্তন অনিবার্য এবং আসন্ন। সূচনা থেকে যারা আছে,

তাদের অনেকে থাকবে না। এবং এর ফলে দলের উন্নতি কতখানি হবে সে-বিষয়ে তার সন্দেহ জাগল।

কিন্তু সে যাই হোক, জলপাইগুড়ি ওরা যাচ্ছে। এবং তারপরে কানপুরও। তারপরে যা হয় হবে। এখন থেকে সে-চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।

॥ চৌদ্দ ॥

চারিদিকে চায়ের সবুজ ক্ষেত।

তার মধ্যে সুন্দর একটি বাংলোয় 'কল-কাকলী'র থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। একটি টিলার উপর বাংলোটি। উপরে উঠে চারিদিকে চেয়ে সুমিত্রার চোখ যেন সবুজের মধ্যে ডুবে গেল।

বারান্দায় চেয়ার সাজানো ছিল। সেখানে বসতে বসতে সকলের মুখ থেকে শুধু একটা শব্দ বার হল : আঃ!

আর কিছু বলার কথা নয়। এই অপরূপ দৃশ্য সমালোচনার বস্তু নয়। শুধু উপভোগের বস্তু। একটি 'আঃ!' শব্দে শুধু জানিয়ে দেওয়া, বড় ভালো লাগল! বড় চমৎকার লাগল!

সাহেব চা-কর আর বেশি নেই। কিন্তু বিলিতি কায়দাটা রয়েছে। উর্দি-পরা বেয়ারা ট্রে-তে করে সরবৎ পরিবেশন করলে।

ওদিকে আর-একটি বাংলো সভাপতিদের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রত্যেক দিনের জন্যে একজন করে সভাপতি। তিন দিনের তিন জন।

তাঁদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক বাগ্মী। অঙ্গে বহু যুদ্ধের অস্ত্রলেখা। বাকি দুজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। দেশজোড়া তাঁদের নাম।

তাঁদের মধ্যে প্রথম জন শুধু এসেছেন। বাকি, দিনের দিন আসবেন আর পরের দিন চলে যাবেন।

অভ্যর্থনার ব্যবস্থা সেখানেও যথেষ্ট।

কিন্তু সেখানে ভিড় নেই। দেশবরেণ্য বাগ্মী দেশবরেণ্য হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ শেষ হয়ে গেছে। কৌতূহল স্তিমিত।

ভিড় এইখানে।

মেয়েরা রং-বেরঙের শাড়ি পরে ঘরে যাচ্ছে, বারান্দায় ঘোরাঘুরি করছে, ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে আগ্রহ-চঞ্চল জনতা সতৃষ্ণ নয়নে দেখছে।

ছোট মেয়েরা খুব কৌতুক বোধ করছে।

বড়রা গর্বিত। এতগুলি লোক কী ধৈর্যের সঙ্গে শুধু তাদের চোখের-দেখা দেখবার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে! নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলিও করছে। যখন বারান্দায় এসে কেউ দাঁড়াচ্ছে, জনতা তখন চঞ্চল হয়ে উঠছে। চলে গেলে, আবার নিজেদের মধ্যে গল্প সুরু করছে। কত অদ্ভুত অনুমান, কত আশ্চর্য কাহিনী ওখানে রটছে, কে বলতে পারে।

এমনকি, যে বেয়ারারা ওদের পরিচর্যার জন্যে এদিক-ওদিক ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে, তারাও ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করছে। বাইরের জনতাও হয়তো বেয়ারাদের ঈর্ষা করছে। শিল্পীদের কত কাছে ঘোরবার সৌভাগ্য বেয়ারা পেয়েছে! কত কথা, কত হাসি-গল্প শুনতে পাচ্ছে!

উলটো দিকের বারান্দায় সুমিত্রা একা নিঃশব্দে বসে আছে।

কুণাল নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়াল।

—কেমন লাগছে?

—অদ্ভুত!

এ ছাড়া আর কী বিশেষণ দেওয়া যেতে পারে!

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এদিকে এর আগে আর কখনও এসেছ?

—না। তোমার দৌলতে এই প্রথম আসবার সুযোগ পেলাম।

সুমিত্রা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আমার দৌলতে বলছ কেন?

—তোমার দৌলতেই তো। 'কল-কাকলী' মানে তুমি ছাড়া আর কি?

—না, না। 'কল-কাকলী' মানে তোমরা সবাই। তার মধ্যে আমিও আছি।

উচ্ছ্বসিতভাবে কুণাল বললে, মধ্যে মানে? একেবারে মাঝখানে। তুমি আমাদের মধ্যমণি। আজ থেকে তোমার নাম রাখলাম 'মক্ষিরাণী।'

সুমিত্রা হেসে বললে, সে আবার কি?

—তুমি আমাদের রাণী মৌমাছি। আমরা, শ্রমিকেরা, যে খাটছি সে তোমার জন্যে।

সুমিত্রা ঠোঁট কোঁচকালে: তুমি বড় বাজে বকো!

—বকি।—কুণাল তৎক্ষণাৎ এ অপবাদ স্বীকার করে নিলে। —তোমার কাছে এলেই মন হালকা হয়ে যায়, কথার বুদ্‌বুদ্‌ ওঠে। আর, কথা মানেই বাজে-কথা। এটুকু উৎপাত তোমাকে সহ্য করতেই হবে।

শাসনের ভঙ্গীতে সুমিত্রা বললে, আচ্ছা। বসো। একটু কাজের কথা শোনো।

ওই ইজিচেয়ারের হাতলের উপর বসে কুণাল বললে, বল।

—কোন্‌দিন কি হবে ঠিক করেছ?

—করেছি। আজ হবে 'চিত্রাঙ্গদা'।

—প্রথম দিনই 'চিত্রাঙ্গদা'? 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করলে হত না?

কুণাল বললে, না। আমি ও-নীতির পক্ষপাতী নই। প্রথম

দিনই দর্শকদের অভিভূত করে ফেলতে হবে। প্রথম দিনেই অর্ধেক যুদ্ধ জয়। তার টানে টানে অবশিষ্ট যুদ্ধও জয় হয়ে যাবে।

সুমিত্রা হাসলে : সে কি সহজ কথা ?

—কিছুই কঠিন নয়। ওদিকের বারান্দায় গিয়ে দেখবে চল, পতঙ্গের দল মরবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। তোমার প্রথম পদক্ষেপেই ওরা বিজিত হবে। প্রথম নূপুরের শব্দেই।

শুনে সুমিত্রা হাসতে লাগল।

কুণাল বললে, তোমরা হাসবে। কিন্তু নারীর রূপ বড় আশ্চর্য জিনিস।

—রূপের কথা বলছ কেন ? নাচের কথা বল।

সুমিত্রার কণ্ঠে ঈষৎ বিরক্তি।

—নাচ ক'জন বোঝে, সুমিত্রাদি। তোমার নাচের যে বিভিন্ন ভঙ্গী তার মানে ক'জন জানে ? নাচও আছে, কিন্তু সেটা উপলক্ষ্য।

এ প্রসঙ্গ সুমিত্রা চাপা দিলে। কুণালকে বাজে কথা বলবার সুযোগ দিলে সে আর থামবে না।

বললে, তাহলে আজ 'চিত্রাঙ্গদা'।

—আজ 'চিত্রাঙ্গদা'। তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কাল 'নগর-নটী', পরশু 'গোপা'।

কুণালের কথাই সত্য হল। প্রথম অভিনয়েই 'কল-কাকলী' বাজি মাৎ করলে। নৃত্য যে এত মনোহর হতে পারে, নাচের ছন্দ হাতের ইসারা যে এমন সুন্দর এবং সহজবোধ্য হতে পারে, অনেকেই তা ভাবতে পারেনি।

নাচ, না নাচ। কিছু দেহের অনাবৃত অংশ, কিছু দেহের রিরংসা-উদ্দীপক ভঙ্গী, কিছু চোখের ইসারা। কিন্তু এ তা নয়। হিল্লোলিত

ছন্দের গতিবেগ ঘন ঘন পরিবর্তনশীল নৃত্যভঙ্গীতে, কখনও নূপুরের দ্রুততালে, কখনও মন্থর নিঃশব্দ পদসঞ্চারণে মুগ্ধ স্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহে যেন একটা স্বপ্নলোক রচিত হল। নেপথ্য-সঙ্গীতে সেই স্বপ্ন যেন মূর্তি পেল।

নিস্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহ মন্ত্রমুগ্ধ।

সেই নিস্তব্ধ ভঙ্গ হচ্ছিল শুধু মাঝে মাঝে যবনিকা-পতনের সময়, উল্লসিত করতালিতে।

সুমিত্রা নিজেও যেন কিরকম হয়ে গেল।

সে যেন সে নয়। সে যেন অন্য। স্বয়ং চিত্রাঙ্গদা।

রাত্রি দশটায় অভিনয় ভঙ্গ হল যখন তখন—সুমিত্রা শ্রান্ত। যেন দাঁড়াতে পারছে না। অন্ধকার পথে দু'পাশের জনতার স্তুতিবাদ শুনতে শুনতে বাংলোয় ফিরল।

বাংলোয় ফিরে বন্ধুদের মুখেও সেই একই কথা। কুণাল বললে, সুমিত্রাদি, তুমি অদ্ভুত, তুমি আশ্চর্য!

উদ্যোক্তাদের কয়েকজন বাংলো পর্যন্ত ওদের সঙ্গে এসেছিলেন। তাঁরাও বললেন, এত সুন্দর নৃত্য তাঁরা কখনও দেখেননি। তাঁদের উদ্যোগ সার্থক, জীবন ধন্য।

সকালে রাজনৈতিক বাগ্মীপ্রবর দিশারী মহাশয় নিজে এলেন সুমিত্রাকে অভিনন্দন জানাতে।

সুমিত্রা উঠে দাঁড়িয়ে দিশারী মহাশয়ের পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলে।

সকলে অবাক।

সুমিত্রা বললে, আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ি আপনাকে অনেকবার দেখেছি। আমার বাবার নাম বিপিনবাবু।

—তোমার নাম সুমিত্রা না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দিশারী মহাশয় ছোট ছেলের মতো হো-হো করে হেসে উঠলেন: আমাকে তাহলে তুমি দোষ দিতে পারবে না, মা। তোমাকে চিনতে পারিনি বটে, কিন্তু তোমার নাম মনে আছে।

বললেন, বাঃ! বাঃ! বড় সুন্দর তোমার নৃত্য, মা। বড় আনন্দ দিয়েছ কাল। ভারী ভালো লেগেছে।

বার বার আপন-মনেই বৃদ্ধ জননেতা সুমিত্রার নাচের প্রশংসা করতে লাগলেন। বিপিনবাবুর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করে অনেক খবর নিলেন।

বললেন, আমরা তুজনে একই সঙ্গে রাজনীতি করেছি। তারপরে ওর জীবিকার্জনের সমস্যা এল। ও পাটের বাজারে চলে গেল। তারপরেও কিছুকাল পরস্পর সংযোগ ছিল। ইদানিং কিছুকাল আর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তার কাছে আমার কথা বলো। তোমার মাকে আমার নমস্কার দিয়ো।

ওদের পরিবার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন: ওরা ভাই-বোন ক'টি, সুমিত্রার বিয়ে হয়েছে কিনা, কোথায় বিয়ে হয়েছে, অন্যান্য ভাই-বোন কে কি করে?

অবশেষে বললেন, একটি প্রশ্ন জিগ্যেস করব মা, যদি কিছু মনে না কর।

সুমিত্রা করজোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

বললে, বলুন—

বললেন, নৃত্য সম্বন্ধে আমার পড়াশোনা কিছুই নেই, মা। তবে এককালে মুদ্রা সম্বন্ধে সামান্য কিছু অধ্যয়ন করেছিলাম। তার মধ্যে তু'চারটে মুদ্রা মনেও আছে। তোমার নাচেও মুদ্রা আছে। সেগুলি কি সব যথাযথ প্রয়োগ করছিলে, মা?

সুমিত্রা বললে, তা আমি ঠিক বলতে পারব না। যে মুদ্রা আমার ভালো লেগেছে সেগুলি দরকারমতো প্রয়োগ করেছি। সব জাগায় মানে বুঝে প্রয়োগ করিনি।

দিশারী মহাশয় হাসলেন : আমারও তাই মনে হল।

কুণাল সুমিত্রার সাহায্যে এগিয়ে এল।

সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তাতে কি খুব ক্ষতি হয়েছে ?

দিশারী মহাশয় বললেন, যাঁরা মুদ্রা চেনেন তাঁদের কাছে ক্ষতি হয়েছে। যাঁরা চেনেন না তাঁদের কাছে ক্ষতি-বৃদ্ধির প্রশ্ন নেই।

—ক'জন আর চেনেন ?

—মুষ্টিমেয় জনকয়েক। কিন্তু,—দিশারী মহাশয় হাসলেন,—মানুষের অজ্ঞতার সুযোগই বা নেবে কেন ?

—মুদ্রা তো সংকেত মাত্র ?

—হ্যাঁ। কিন্তু অর্থহীন সংকেত নয়। সংকেত জানা থাকলে নৃত্যের অর্থ সহজবোধ্য হয়। সংকেতগুলি তোমাদের নিজেদের যেমন জানা উচিত, দর্শকদেরও তেমনি জানানো উচিত। তাহলে দর্শকের সঙ্গে নৃত্যের সংযোগ যথার্থ হয়।

ভদ্রলোক কথাগুলি এমন অসূয়াশূন্য ভাবে বললেন যে, কুণাল এর প্রতিবাদ করতে পারলে না।

শেষ দুটি নৃত্যনাট্যও চমৎকার হল।

যৌবনমদমত্তা নগর-নটীর দুর্দান্ত জীবন অবশেষে ভগবান তথাগতের চরণপ্রান্তে এসে শান্ত হয়ে গেল। অসংখ্য প্রেমিকের হৃদয় নিয়ে যে খেলা করেছে, নিজের হৃদয় নিয়েও, ভগবান তাকে কৃপা করলেন। নৃত্যে এই ক'টি দৃশ্য সুমিত্রা চমৎকার ফুটিয়ে তুলল।

কিন্তু তারও চেয়ে চমৎকার হল 'গোপা'।

ভগবান বুদ্ধের অর্ধাঙ্গিনী। এমন সৌভাগ্য ক'জন মেয়ের জীবনে ঘটে ? অথচ তাঁকে ধরে রাখা গেল না। রূপ দিয়ে না, যৌবন দিয়ে না, হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়েও না। জন্ম-দুঃখিনী গোপার সকরুণ কাহিনী অপরূপ নৃত্যের ছন্দে মূর্তি পেল।

প্রশংসার নেশায় মাতাল অবস্থায় সুমিত্রা সদলবলে কলকাতায় ফিরে এল।

কিন্তু দিশারী মহাশয়ের কথাটা তার মনে লেগেছে। মুদ্রাগুলি সংকেত। সেগুলি জানা দরকার। আয়ত্ত করা দরকার। এবং সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা দরকার।

সমস্ত পথ বেশ হাসি-গল্পের মধ্যে দিয়ে এল। তারই মধ্যে কুণালকে মুদ্রাসংক্রান্ত বই এবং কিছু ছবি সংগ্রহ করবার ভার দিলে।

কুণাল বললে, তুমি পাগল হয়েছ, সুমিত্রাদি। ওর কিছু দরকার নেই। একদিন ওগুলো সংকেত ছিল সত্যি। সেদিন বোধহয় ওর সঙ্গে দর্শকেরও পরিচয় ছিল। আজ সংকেতের অর্থ কেউ জানে না। তুমি ঠিকমতো প্রয়োগ করলেই বা কি হবে? দর্শকরা কি জানে ওর অর্থ?

সুমিত্রা বললে, জানতে হবে। বিভিন্ন কাগজে প্রবন্ধ লিখে পাঠকদের সঙ্গে মুদ্রাগুলির পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

—তাহলেই হবে ভেবেছ? পড়বে কে?

—যাদের নাচ দেখার অনুরাগ আছে তারাও পড়বে না?

কপালে করাঘাত করে কুণাল বললে, হায়রে দেশ! এদেশের সাধারণ লোকের কিছুতে অনুরাগ নেই। তারা আসে, ছাখে, চলে যায়। ভালো লাগলে বলে,বেশ হয়েছে। মুদ্রা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। অর্থ তার যাই হোক, দেখতে ভালো লাগলেই খুশি। তুমি জানতে চাও, আমি বই, ছবি সংগ্রহ করে দোব। কিন্তু তার কোন সার্থকতা আছে বলে মনে করি না।

সুমিত্রা ভাবতে লাগল।

তাদের সম্প্রদায় যতদিন সৌখীন ছিল, দায়িত্ব বেশি ছিল না। এখন পেশাদার হল। তার সঙ্গে দায়িত্বও বাড়ল। সকলে প্রত্যাশা করবে নৃত্যজগতে তারা কিছু চিহ্ন রেখে যাবে। কিছু দান করে যাবে।

বললে সে-কথা।

বললে, কুণাল, তুমি ভারতবর্ষের কথা ভাবছ কেন? এমন তো হতে পারে, নাচ দেখাতে আমরা সমস্ত পৃথিবী ঘুরব। সমস্ত সভ্য জগৎ আমাদের নাচ দেখবে।

—সে-স্বপ্নও মাঝে মাঝে দেখি।

—তাহলে? তারা প্রশ্ন করবে, তারা জানতে চাইবে। আমাদের নাচ একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর, একটি বিশেষ দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যাতে বাইরের লোক বলবে, এটি ভারতবর্ষীয় নৃত্য। এবং ভারতবর্ষের লোক বলবে, এটি সুমিত্রার নাচ।

এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে সুমিত্রা দমদমে নামল।

সেখান থেকে বাড়ি।

বাড়ি ফিরেই সমস্ত স্বপ্ন ছিঁড়ে গেল।

ছাখে, অপূর্ব ছবির সামনে মুদ্রিত নেত্রে দাঁড়িয়ে। গায়ে জামা নেই। কোঁচা মেঝেয় লোটাচ্ছে। কিন্তু আজ আর ধূপ-ধূনা, পুষ্প-মাল্যের বাড়াবাড়িও নেই।

রামধন সুমিত্রার জিনিসপত্র গিন্নিমার ঘরে রাখলে। ওর ঘরটাই সুমিত্রা এখন স্থায়িভাবে ব্যবহার করছে।

রামধনকে জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ রে, বাবু আজ কোর্টে যাননি?

রামধন বললে, উনি তো আর কোর্টে যান না।

—একদিনও না?

—না।

রামধন পাখাটা খুলে দিলে। সুমিত্রা খাটের উপর বসল।

—আপনার চা আনি মা?

—আন্।

একটু পরে রামধন চা নিয়ে এল।

চাকর-বাকরকে সুমিত্রা কোনদিন অপূর্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন করেনি। আজ আর পারলে না।

জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ রে উনি খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো করেন তো?

—কই আর করেন!

রামধন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

—খাওয়ার সময় তোরা সামনে থাকিস তো?

—কাউকে থাকতে দেন না, মা। আমাদের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যেতে বলেন।

—তোদের কি খুব বকাবকি করেন?

—মোটেই না, মা। উনি নিজেকে নিয়ে থাকেন। উনি আর ছবি। কখনও শুয়ে আছেন। কখনও বসে। কখনও বা বাগানে পায়চারি করছেন।

—তোদের সঙ্গে কথা বলেন না?

—বলেন বইকি? কম।

—তোদের ভয় করে না?

রামধন বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ভয় করবে কেন মা?

—না, তাই জিগ্যেস করছিলাম। সাধু-সন্ন্যাসী কেউ আসে নাকি?

—কই দেখিনি। তবে সন্ধ্যেবেলায় মাঝে মাঝে দু'চারজন বন্ধুবান্ধব আসেন। গল্প-সল্প করেন।

—হুঁ।

একটু পরে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, আমার খোঁজ করছিলেন নাকি?

—কই না।

—আমি এখানে ছিলাম না, জানেন?

একটু চিন্তা করে রামধন বললে, বোধহয় না।

সুমিত্রা আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না।

॥ পোনেরো ॥

অপূর্বর ব্যাপারটা সুমিত্রা বুঝতে পারছে না।

তার নিজের সন্দেহ—অপূর্বর মস্তিষ্ক সুস্থ নয়। কিন্তু ঠাকুর-চাকর অসুস্থতা বা অস্বাভাবিকতা কিছু লক্ষ্য করছে না। অপূর্ব ছবি নিয়ে আছে বটে, কোর্টে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে সত্য, কিন্তু পড়াশুনা করে, মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধব আসে, তাদের সঙ্গে গল্পও করে।

তাহলে কি এটা ?

বিকেলে অপূর্ব বাগানে একা বসেছিল। সুমিত্রা একখানা চেয়ার টেনে তার কাছে বসল।

—জান, আমরা জলপাইগুড়ি গিয়েছিলাম।

—কবে ?

বোঝা গেল, সুমিত্রার কোনো খবরই অপূর্ব রাখে না। সুমিত্রা মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হল হয়তো।

বললে, আজ দুপুরে ফিরেছি। তিন দিনের বায়না ছিল।

অপূর্ব যেন আকাশ থেকে পড়ল ঃ বায়না ! বায়না কিসের ?

—নাচের।

—ও।

এখন আবার যেতে হবে কানপুর।

—বায়না ?

—হ্যাঁ।

অপূর্ব মুচকে হাসলে ঃ তোমরা কি পেশাদার হয়ে যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ। শুধু অবসর-বিনোদনের জন্যে নাচার কোনো অর্থ হয় না ! তুমি কি বল ?

—তা ঠিক। কোনো জিনিস 'সিরিয়াস্‌লি' নিতে গেলে তার জন্যে সমস্ত সময় এবং উদ্যম নিয়োগ করা দরকার।

অপূর্বর হাসিতে সুমিত্রা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। এই কথায় কিছুটা উৎসাহিত হল।

বললে, তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করি। নাচের মুদ্রা সম্পর্কে কিছু বই তোমার জানা আছে?

অপূর্ব বললে, একখানা বইতে সব পাবে না।

সে কতকগুলো বই এর নাম করলে। বললে, কতকগুলো আমার লাইব্রেরীতে পাবে বোধহয়। খুঁজে দেখো।

—আছে?

সুমিত্রা উৎসাহিত হয়ে উঠল।

অপূর্ব বললে, থাকার তো কথা। অনেকদিন দেখিনি। আছে বোধ হয়।

সুমিত্রা চেয়ে চেয়ে দেখলে, অপূর্বর মধ্যে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা নেই। স্মরণশক্তি পূর্ববৎ প্রখর। কথায় কোন গোলমাল নেই। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, কথায় ঈষৎ জড়তা আছে। আর কেমন একটা আলস্য।

বললে, আচ্ছা, আমি যে এখানে-ওখানে যাচ্ছি, এতে কি তুমি বিরক্ত হও?

—না। কে বললে?

কেউ বলেনি। আমি এমনিই জিগ্যেস করছি।

অপূর্ব বললে, না, বিরক্ত হই না। তুমি যে এখানে-ওখানে যাচ্ছ, আমি টেরই পাই না।

সুমিত্রা খুশি হল না। তার সন্দেহ হল অপূর্বর কাছে তার প্রয়োজন বুঝি শেষ হয়ে গেছে। তার যাওয়া-আসা, থাকা-না-থাকা কিছুরই সঙ্গে অপূর্বর আর সম্পর্ক নেই। অপূর্ব আছে অন্য লোকে, অন্য আনন্দের মধ্যে নিমগ্ন। শুধু সুমিত্রা কেন, পার্থিব কোনো বস্তুর সঙ্গেই তার আর সম্পর্ক নেই। কিছুরই উপর অনুরাগও নেই, বিরাগও নেই। একটা আশ্চর্য অবস্থা।

সুমিত্রা বললে, এই নাচের সূত্রেই তোমাকে পেয়েছি। তুমি আবার আমাকে তেমনি করে কিছু কিছু নির্দেশ দিতে পার না?

—না।

পরিষ্কার—না।

—না কেন?

—ভালো লাগে না। সুমিত্রা, ওসব কিছু নয়! ওর মধ্যে কিছু নেই।

—আনন্দ তো আছে।

—না। তোমরা যাকে আনন্দ বল, সে আনন্দের ছায়া মাত্র। আসল আনন্দের স্বাদ আলাদা।

—সে কিরকম?

অপূর্ব হাসলে, তা কথায় বোঝানো যায় না। যে স্বাদ পেয়েছে সেই জানে কেমন। একটি অন্ধ জানতে চেয়েছিল, দুধের রং কেমন। বলা হয়েছিল, সাদা। সাদা কিরকম? বকের মতো। বক কিরকম? হাত বেঁকিয়ে তাকে বকের গলার ভঙ্গীটা দেখানো হয়েছিল। লোকটি বাঁকানো হাতটা মনোযোগের সঙ্গে স্পর্শ করে গম্ভীরভাবে বলেছিল, বুঝেছি। কাস্তের মতো।

অপূর্ব হাসতে লাগল।

সুমিত্রা লক্ষ্য করলে, হাসির মধ্যে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা কি অসুস্থতা নেই। সহজ স্বচ্ছ হাসি।

বললে, তুমি যা কর, ও আমার ভালো লাগে না।

—আমি কি করি?

—ওই ছবির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা, মনে মনে তার সঙ্গে কথা বলা।

অপূর্ব হাসলে, তুমি এসে বসেছ, তোমার সঙ্গে কথা বলছি। সে এলে তার সঙ্গেও কথা বলি। এর মধ্যে আশ্চর্যের কি আছে?

সুমিত্রা বললে, আশ্চর্যের এই যে, সত্যি সত্যি তিনি আসেন না। ওটা তোমার ভুল।

—আমি দেখি, সে এল, শুনি তার কথা,—সে ভুল?

—হ্যাঁ।

অপূর্ব একটু যেন বিরক্ত হল। কিন্তু সে-ভাবটা গোপন করে বললে, ভুল নয়।

তারপর বললে, ভুলই যদি হয়, আমি যে দিবারাত্র একটা অপার্থিব আনন্দের মধ্যে ডুবে রয়েছি সে তো আর ভুল নয়।

সেও ভুল। তোমার জন্যে আমার ভয় হয়।

অপূর্ব হাসলে। কোনো উত্তর দিলে না।

লাইব্রেরীতে বইগুলো পাওয়া গেল। বই সম্বন্ধে অপূর্ব অত্যন্ত সচেতন। বই কাউকে দেয় না।

একখানা নিয়ে সুমিত্রা পড়তে আরম্ভ করে দিলে। ছবি-গুলো মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লগল। দেখলে, তার মুদ্রার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য আছে। ঠিক-ঠিক হয়নি। আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেগুলো সে আয়ত্ত করতে লাগল। আয়ত্ত করা দুরূহ। যথেষ্ট অভ্যাস দরকার।

একদিন বিকেলে অপূর্বর ঘরে এল।

অপূর্ব উঠেছে তখন।

বই-এর একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সুমিত্রা বললে এইটে আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবে?

অপূর্ব বইখানা হাতে করে নিলে। নিতে গিয়ে তার আঙুলগুলি সুমিত্রার আঙুল স্পর্শ করলে।

সুমিত্রার শরীরে যেন একটা শিহরণ খেলে গেল।

অপূর্ব মুদ্রাটা দেখলে। পাশের ব্যাখ্যাটা পড়লে। একবার যেন বিষয়টা সুমিত্রাকে বোঝাবার চেষ্টা করলে। তারপর বইখানা

নামিয়ে রেখে বললে, এখন থাক্। ভালো লাগছে না। অন্য সময় চেষ্টা করা যাবে বরং।

সুমিত্রাও বললে, থাক্।

অপূর্বর বাঁ হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে সে নড়াচাড়া করতে লাগল।

আঙুলগুলি যেন শীর্ণ হয়ে গেছে। নীল শিরাগুলি বেরিয়ে পড়েছে।

বললে, তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ।

—কই, বুঝতে পারি না কিছু।

—দুর্বল বোধ কর না?

—না।

সুমিত্রা বললে, হয়েছে। শুনছি খাওয়া-দাওয়াও ঠিকমতো কর না।

—কে বললে? রামধন?

—রামধন বলবে কেন? আমি নিজেও তো দেখছি। সময়ে খাওয়া-দাওয়া মোটেই কর না।

কথার মধ্যে স্নেহের স্পর্শ ছিল। অপূর্ব চুপ করে রইল।

সুমিত্রা বললে, আমরা পরশু যাচ্ছি কানপুর। যাবে আমাদের সঙ্গে?

—নাচতে?

অপূর্ব হাসলে।

ভ্রূকুটি হেনে সুমিত্রা বললে, সবাই কি নাচতেই যায়? তুমি থাকলে আমাদের অনেক উপকার হবে।

কিচ্ছু উপকার হবে না। তা ছাড়া আমার সময় নেই।

—কেন? কি তোমার কাজ? কোর্টে যাওয়াও তো ছেড়ে দিয়েছ।

—কাজ আছে।

অপূর্ব গম্ভীর হয়ে গেল।

সুমিত্রা আর বেশি অনুরোধ করতে সাহস করলে না।

॥ ষোলো ॥

ওরা আর একখানা নতুন নাটক রিহার্সালে নামালে : মদন-ভস্ম।

নাটকটি কুণাল নিজেই রচনা করলে। চারিটি নৃত্যের সমষ্টি : গৌরীর তপস্যা, শিবের তপস্যা, তপোভঙ্গ এবং রতি-বিলাপ।

নৃত্যের নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে সুমিত্রা মেতে উঠল। তার নাইবার-খাবার সময় নেই। নতুন নতুন সুর এবং নতুন ধরনের নৃত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

অর্থের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে অত্যন্ত। সেই সমাধানের চেষ্টায় কুণাল ব্যস্ত।

লক্ষ্ণৌ থেকে একখানা চিঠি এসেছে। ওরা ২৩শে যাচ্ছে কানপুর। কুণাল তাদের লিখে দিলে পত্রপাঠ কলকাতা অসবার জন্য। অথবা তারা ২৩শে, ২৪শে, ২৫শে, কানপুরে এসেও দেখা করতে পারে।

মদন-ভস্মের জন্যে কিছু আধুনিক দৃশ্যপট এবং আলোক-সম্পাত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সেজন্যেও যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। আগে ব্যয় অল্প ছিল। চাঁদা তুলেই সেই ব্যয় মোটামুটি সংকুলান হত। তার উপর মাঝে মাঝে 'শো' দিয়েও কিছু টাকা উঠত। 'শো'র ব্যবস্থা এখনও করা যায়। কিন্তু পেশাদার হওয়ার পরে নিজেদের মধ্যে ছাড়া আর কোনো দিকে চাঁদা তোলার অসুবিধা আছে।

কুণাল বললে, কানপুরের পরে যদি লক্ষ্ণৌ-এর বায়নাটা পাওয়া যায় তাহলে মোটামুটি অর্থের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যা অভাব থাকবে, কলকাতায় 'মদন-ভস্ম'র একটা অনুষ্ঠান করে 'তা পূরণ করা সম্ভব।

সুমিত্রা বললে, কিন্তু লক্ষ্ণৌ-এর বায়না যে পাওয়া যাবেই এমন কোনো স্থিরতা তো নেই!

—তা নেই। তবে সম্ভাবনা খুব বেশি।

সিনেমা-পত্রিকার সেই রিপোর্টারটির সঙ্গে এদের এখন যথেষ্ট বন্ধুত্ব হয়েছে। অমল তার নাম। এ সম্বন্ধে তার জ্ঞান এবং পড়াশুনা খুব গভীর নয়, কিন্তু চমৎকার একটা বোধ আছে।

প্রায়ই এদের মহড়ায় সে আসে। এবং নানারকম পরামর্শ দিয়ে সাহায্যও করে।

তার চেয়ে বেশি সাহায্য এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা সাহায্যের আশ্বাস তার কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। তার একটি বিশেষ বন্ধু, তাদের পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বম্বেতে থাকে। তাকে দিয়ে সেখানকার সিনেমা-পত্রিকায় 'কল-কাকলী' ও সুমিত্রা সম্বন্ধে কিছু লেখাবার চেষ্টা করছে। সুমিত্রার বিভিন্ন ভঙ্গীর কয়েকখানি ছবি ও এই উদ্দেশ্যে সে বন্ধুর কাছে পাঠিয়েছিল।

ব্যাপারটা 'কল-কাকলী'র কাউকে সে বলেনি। বন্ধুর অনিশ্চিত ভরসার উপর প্রত্যাশা জাগানো সঙ্গত হবেনা বলেই জানায়নি।

একদিন বম্বের একখানি বিখ্যাত সিনেমা-পত্রিকা ত্নম করে সে 'কল-কাকলী'র টেবিলের উপর ফেললে, বম-শেলের মতো।

কি ব্যাপার! কি ব্যাপার!

পড়েই দেখুন না।

খোলবার দরকার হল না। মলাটের উপরই সুমিত্রার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীর নৃত্যের ছবি।

একি! এ যে সুমিত্রাদি!

আমি। আমি কি!

এই তো তোমার ছবি! বম্বের কাগজে! কি আশ্চর্য! দেখি, দেখি! দেখি, দেখি!

কাগজখানা নিয়ে প্রথম একচোট কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। প্রত্যেকে দেখতে চায়। সুমিত্রার ছবি হঠাৎ বম্বের কাগজে প্রকাশিত হল কি করে? ছবি পেলে কোথায়? কে পাঠালে?

কে পাঠালে বোঝা কঠিন নয়।

কুণাল প্রসন্ন দৃষ্টিতে অমলের দিকে চাইলে।

—এ তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। এমন বন্ধু আমাদের আর কে আছে।

অমল হাসতে লাগল।

সুমিত্রার দিকে চেয়ে কুণাল বললে, অমল একটা মস্ত কাজ করেছে। বম্বের এই কাগজখানা ভারতবর্ষের সর্বত্র যায়। এর মতামতের মূল্যও খুব বেশি।

অনেকক্ষণ ধরে এই নিয়ে খুব আনন্দ-উল্লাস হল। সকলেই অমলকে ধন্যবাদ জানালে। সুমিত্রা মুখে কিছু বললে না। কিন্তু তার প্রসন্ন দৃষ্টি থেকে অজস্র ধারায় কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ল।

অমল মুগ্ধ।

বললে, বম্বের কাগজে ছাপবে কিনা সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। এদিককার খবর ওরা ছাপে কম। সেজন্যে কাউকে কিছু বলিনি। দু'তিনদিন আগে খবর পেয়েছিলাম, ছাপছে। নাচের ওঁর ভঙ্গীটি ওদের ভালো লেগেছে। তাও বলতে সাহস করিনি। আজকের ডাকে কাগজখানা হাতে পেয়ে ছুটে এলাম। আমারও বিশ্বাস, এতে কাজ হবে অনেক।

কুণাল বললে, সুমিত্রাদি, কিছু খাওয়াও।

সুমিত্রা তৎক্ষণাৎ কয়েকখানা নোট বের করে দিলে।

খ্যাতি জোয়ারের মতো। অনুকূল সময়ে যখন আসে, বন্যার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

সুমিত্রার তাই হয়েছে। নাচছে সে অনেকদিন থেকে। ভালোই নাচছে। প্রশংসা যে পায়নি তা নয়। কিন্তু সময়টা তখনও ঠিক অনুকূল হয়নি।

অমল উপলক্ষ্য মাত্র। সময় আসতে সে এসে জুটেছে। এবং এখন যে চেষ্টা করছে তাই সফল হচ্ছে। তার কাছ থেকে সুমিত্রাদের বহু প্রত্যাশা এবং সেও আশা করছে প্রচারের দিক দিয়ে সুমিত্রাদের জন্যে সে কিছু করতে পারবে।

সকালে কুণার এল সুমিত্রার বাড়ি অমলকে সঙ্গে নিয়ে।

সুমিত্রা পরম সমাদরে তাকে অভ্যর্থনা করে নিচের ড্রইং-রুমে বসালে। বললে, কি সৌভাগ্য! আপনি নিজে এসেছেন আমার বাড়ি!

তখনই হেসে বললে, নিজে আসেননি বোধ হয়। কুণাল টেনে এনেছে।

অমল তাড়াতাড়ি বললে, না, না। বরং কুণালবাবুকেই আমি টেনে এনেছি। জিগ্যেস করে দেখতে পারেন।

—তাহলে তো সত্যিই ভাগ্যের কথা। দাঁড়ান, আসছি।

ভিতরে গিয়ে সুমিত্রা চায়ের কথা বলে এল।

একটুখানি সে অস্বস্তি বোধ করছিল।

পাশের অফিস-ঘরে অপূর্ব বসে। রোজ সে নিচে আসে না। মাঝে মাঝে আসে সকালের দিকে। আর কোনো কোনো দিন বন্ধুবান্ধব এলে সন্ধ্যার দিকেও।

সুমিত্রা অনুমান করে, অপূর্ব এখন যে জগতে বাস করছে, নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ সে পছন্দ করে না। তার চেয়েও বেশি চিন্তা, অমলের জোরে কথা বলা অভ্যাস। জোরে কথা অপূর্ব একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু ওরা যখন এসে পড়েছে এবং ওদের যখন যেতে বলা যায় না, তখন কি আর করা যায়?

একটা কান সুমিত্রা অফিস-ঘরের দিকে খাড়া রাখলে।

অমল বললে, কুণালবাবু বলছিলেন আপনি নাচের মুদ্রা সম্পর্কে আগ্রহান্বিত। আমাদের অফিসের লাইব্রেরীতে খোঁজ করে এই একখানা বই পেলাম। দেখুন আপনার কাজে লাগবে কিনা।

সাগ্রহে সুমিত্রা বইখানা নিলে। কয়েকটা ছবি দেখলে। এখান-ওখান থেকে ছু'একটা লাইন পড়লে। প্রকাশের তারিখটা দেখলে।

বললে, বইখানি খুব সম্প্রতি বেরিয়েছে।

অমল বললে, হ্যাঁ। খুব সম্প্রতি। মনে হয়, বইখানা আপনার কাজে লাগবে। আপনি রেখে দিতে পারেন।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, বইখানা বাজারে পাওয়া যায় নিশ্চয়।

অমল বললে, আশা করি।

সুমিত্রা একটুকরো কাগজে বইটির নাম এবং গ্রন্থকার ও প্রকাশকের নাম টুকে নিলে।

বইখানি অমলকে ফেরত দিয়ে বললে, লাইব্রেরীর বই রাখতে আমার ভয় হয়। হারিয়ে গেলে মহা লজ্জায় পড়ব। বইখানি আপনি নিয়ে যান। দয়া করে যে সন্ধান দিলেন তার জন্যে আমি খুব উপকৃত।

কুণালকে বললে, এখানে খোঁজ করে দেখ। যদি পাওয়া যায় কিনে আনবে। না পাওয়া গেলে, বম্বে থেকে আনিয়ে নিতে হবে। দেরি করবে না।

কুণাল কাগজের টুকরোটা পকেটে রেখে বললে, আজকেই আমি খোঁজ করব! বিকেলে জানতে পারবে।

—আচ্ছা।

একটু পরে সুমিত্রা বললে, কুণাল, কোনো বাগান-বাড়ি তোমার জানা আছে।

ক'দিন থেকে কথাটা সুমিত্রা ভাবছে। এই বাড়ি এবং ওই অপূর্বকে সে সহ্য করতে পারছে না। এখানে থাকলেই তার স্ফূর্তি উবে যায়। মনে হয় যেন ভুতুড়ে বাড়িতে রয়েছে। মাঝে মাঝে অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে গা-ছমছম করে।

ক'দিন থেকেই ভাবছে, কানপুর যাবার আগে দিন-কয়েকের জন্যে কাছাকাছি কোনো নিরিবিলি জায়গায় যেতে পারলে ভালো হয়। সেই কথাটাই বললে।

কুণাল বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, বাগান-বাড়ি? কি হবে?

মৃদুহাস্যে সুমিত্রা উত্তর দিলে, কয়েকদিন থাকব।

—থাকবে?

—হ্যাঁ। কেমন শ্রান্তি বোধ করছি। কানপুর যাওয়ার আগে শরীর এবং মন ঝালিয়ে নিতে চাই।

কুণাল এবং অমল দুজনেই চেয়ে দেখলে। কেন এতদিন লক্ষ্য করেনি কে জানে, সুমিত্রার শরীর সত্যই শ্রান্ত। মুখ ফ্যাকাশে। চোখে ঔজ্জ্বল্য নেই। হাসছে, তাও ফিকা।

বললে, সত্যি তোমার বিশ্রাম দরকার। খবর নিচ্ছি বাগান-বাড়ির।

—নাও। আমরা সদলবলে থাকতে চাই। অমলবাবু, আপনিও আসুন না। অসুবিধা আছে?

অমল সোৎসাহে বললে, কিছুমাত্র না। আপনাদের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাতে পারলে খুবই খুশি হব। আমিও চেষ্টা করছি বাগান-বাড়ির। দেখি কি হয়!

ওরা চলে যেতে সুমিত্রা উঁকি দিয়ে দেখলে, অফিস-ঘর থেকে অপূর্ব কখন উঠে চলে গেছে। মানুষের ভিড়, জোরে কথা, হাসিগল্প সে সহ্য করতে পারে না।

এও তো বড় আশ্চর্য।

বাড়িতে মানুষ আসবে না? হাসবে না? জোরে কথা বলবে না? এ কী উৎপাত!

এই বাড়িটাই সুমিত্রার আর ভালো লাগছে না? এ বাড়িও না, অপূর্বকেও না। কিরকম যেন জবুথবু হয়ে যাচ্ছে অপূর্ব। বুড়োমানুষের মতো। আস্তে চলে, আস্তে কথা বলে। হাসে না বললেই চলে। যদি-বা হাসে, একটুখানি আল্‌তো হাসি।

যেন স্বপ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

উপরে গিয়ে সুমিত্রা দেখলে, বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে অপূর্ব খবরের কাগজ পড়ছে।

পড়ছে না, চোখ বুলোচ্ছে। কি হয়তো তাও না। মুখের সামনে খবরের কাগজ খুলে রেখে অন্য চিন্তা করছে।

সুমিত্রা বললে, তোমার একটু অসুবিধা হল।

—কেন?

—ওঁরা এসেছিলেন।

—আমি তো তখনই ওপরে চলে এলাম।

—অসুবিধা হল বলেই তো এলে।

—না, ঠিক আমার অসুবিধার জন্যে নয়। ভাবলাম তোমরা হয়তো গল্প করবে, কি কাজের কথা বলবে। তোমাদের অসুবিধা হতে পারে।

ঠোঁট বেঁকিয়ে সুমিত্রা বললে, আমি ভাবলাম তুমি তো মানুষের ভিড়, জোরে কথা, হাসিগল্প সহ্য করতে পার না, সেইজন্যেই চলে এলে।

—তাও বটে, কিন্তু শুধু সেইজন্যই নয়।

—তাও বটে কেন? মানুষের বাড়ি মানুষ আসবে না?

নিরীহ কণ্ঠে অপূর্ব বললে, কেন আসবে না?

—এলে, হাসতে পারে।

—পারেই তো।

—জোরে কথাও বলতে পারে।

—নিশ্চয়।

—কিন্তু এসব তুমি যদি সইতে না পার, লোকে আসবে কেন?

সুমিত্রার ধমক খেয়ে অপূর্ব দমে গেল। করুণ কণ্ঠে বললে, আমি তো কাউকে আসতে নিষেধ করিনি। আমার কষ্ট হয়, ওপরে চলে আসি, সরে যাই।

—কষ্ট হয় কেন?

—হয়।

—কেন হয় বলতে হবে।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে অপূর্ব বললে, সুর কেটে যায়।

কিসের সুর?

—সে তুমি বুঝবে না।

—বুঝতে চাইও না। তুমি তোমার সুর নিয়ে থাক, আমি চলে যাই।

সুমিত্রার ক্রুদ্ধকণ্ঠে অপূর্ব থতমত খেয়ে গেল।

—কোথায় যাবে?

—যেখানে হোক। তোমার কাছ থেকে দূরে। তুমি ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠছ।

অপূর্ব নিঃশব্দে ম্লানমুখে বসে রইল।

বললে, একটা কাজ করলে হয়।

—কি কাজ?

বললে, তোমার কাছে নানা দরকারে অনেক লোক আসবে। তুমি কোথায় যাবে? বরং আমি দেখি যদি কলকাতার বাইরে নিরিবিলি কোথাও থাকার ব্যবস্থা করতে পারি। কলকাতার হট্টগোলে আমার কষ্টও হচ্ছে।

সুমিত্রার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে অপূর্ব ধীরে ধীরে চলে গেল। তার মুখে ক্রোধ অথবা বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই।

॥ সতেরো ॥

কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ, সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে সুমিত্রা প্রথমেই অপূর্বর ঘরে উঁকি দিলে।

সুমিত্রা চমকে উঠল। ঘর খালি।

খাট নেই, ঘরের কোনো আসবাবই নেই। সে-ছবিটিও নেই।

—রামধন!

ঠাকুর উপরে এসে জানালে, রামধন তো নেই, মা।

কোথায় গেল?

—বাবুর সঙ্গে গেছে।

—বাবুর সঙ্গে? কোথায়?

—কলকাতার বাইরে বাবু কোথায় একটা বাগান-বাড়ি কিনেছেন, সেইখানে।

সুমিত্রা স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

—কখন ফিরবেন?

—সেইখানেই থাকবেন শুনছি।

সেইখানে থাকবেন। অপূর্ব আর রামধন।

মনে পড়ল, কিছুদিন আগে এইরকম একটা কথা অপূর্ব বলেছিল বটে। কলকাতার হট্টগোল তার ভালো লাগছে না। সে কলকাতার বাইরে নিরিবিলি কোনো জায়গায় থাকতে চায়। এখানে তার সুর কেটে যায়!

সুমিত্রা মনে মনে ব্যঙ্গভরে হাসল।

সুতরাং অপূর্ব গেছে, রামধন গেছে, আর গেছে সেই ছবিটা। আর—ঘরের ভিতরে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলে—গেছে, থাকবার জন্যে যা আসবাবপত্র আবশ্যকীয় তাই।

যাক। একদিক দিয়ে বাঁচা গেল।

বিকেলে সুমিত্রা অমলের পত্রিকা-অফিসে ফোন করলেঃ অমলবাবু আছেন ?

আমি কথা বলছি।

আমি সুমিত্রা।

কি আশ্চর্য ! আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম।

বাজে কথা বলবেন না।

বাজে কথা নয়, সত্যি কথা। কখন ফিরলেন ?

আজ সকালে।

কি রকম হল ?

টেলিফোনে বলব কেন ? এসে শুনতে হবে।

আমি প্রস্তুত। বলুন কখন কোথায় দেখা হবে।

এখনই। আমার এখানে।

উত্তম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অমল এসে গেল। চাকরকে বলা ছিল। সে অমলকে সটান দোতলার বসবার ঘরে নিয়ে এল।

অমল জিজ্ঞাসা করলে, এখন বলুন কেমন হল।

—আশাতীতরূপে ভালো। আপনাকে সব আগে জনাই, উমার তপস্যার নাচের যে ভঙ্গীটি আপনি দিয়েছিলেন, সেটা সকলের ভালো লেগেছে। এমন কি, ওখানকার কাগজে পর্যন্ত তার উল্লেখ করেছে।

—তাই নাকি ?

—কিন্তু আপনার প্রাপ্য প্রশংসা কুণাল বেমালুম আত্মসাৎ করে নিলে। ও বললে, ভঙ্গীটা ওরই দেওয়া। আমি চুপ করে শুনলাম। প্রতিবাদ করতে সাহস করলাম না।

—আপনিও ভয় পান ?

—কে ভয় করেনা বলুন। ও হয়কে নয় করে, নয়কে হয়। ওকে ভয় না করে উপায় আছে ?

সুমিত্রা হাসতে লাগল।

বললে, তবে তাকে ফেরবার সময় বললাম, কাজটা ভালো করনি। পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করা পাপ।

—সে কি বললে?

—বললে, আমার পর কেউ নয়। সুতরাং সবারই দ্রব্য আত্মসাৎ করার অধিকার আছে। বলুন আমি কি করতে পারি।

মৃদু হাস্যে অমল বললে, করতে অনেক কিছু পারেন। সে বলে লাভ নেই। যা করবেন সেইটেই বলি: একটু চা খাওয়ান।

শুধু চা?

—আমি অল্পেই সন্তুষ্ট।

একটু ভেবে সুমিত্রা বললে, আচ্ছা, চা আসছে। তারপরে আর একটা কাজ করলে হয় না?

—কি কাজ?

—কুণালকে খবর দিই। সে সুদ্ধ আসুক। তারপর তিনজনে কোনো হোটেলে গিয়ে কিছু খাওয়া যাক।

—আজ্ঞে না।

—কেন? আপনি হোটেলে খান না।

—দু'জনে হলে খাই। তিনজন হলে খাই না।

সুমিত্রা ভ্রূভঙ্গী করলে: এ তো অল্পে সন্তোষের লক্ষণ নয়। বেশ, তাই চলুন।

সুমিত্রা গাড়িখানা বের করতে বললে।

ঘণ্টা-দুই পরে কুণাল এল।

সে গিয়েছিল অমলের অফিসে। শুনলে, সে বেরিয়ে গেছে। তার দেখা না পেয়ে ভাবলে সুমিত্রার ওখানে যায়। এখানে এসে শুনলে, সুমিত্রা আর-একটি বাবুর সঙ্গে বাইরে গেছে।

ভাবলে, তাহলে তারা দুজনেই বোধহয় ক্লাবে গেছে। ক্লাবে এসে শুনলে তারা সেখানেও আসেনি।

কোথায় গেল তারা?

ঠাকুরের মুখে বর্ণনা শুনলে, তাতে বাবুটির সঙ্গে অমলের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। অমল অফিসেও নেই। হতে পারে সে ওদের ফেরার খবর পেয়ে সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তারপরে দুজনে কোথাও হয়তো গেছে।

কিন্তু কোথায় যেতে পারে?

যেখানে যাক, ক্লাবে একবার আসবেই। এই ভেবে কুণাল ক্লাবেই অপেক্ষা করতে লাগল।

আরও কিছুক্ষণ পরেই সুমিত্রা আর অমল এল।

কুণাল জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার? কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, কেন তুমি কি আমাদের খুঁজছিলে?

কুণাল বিরক্তভাবে বললে, বেশ। আমি প্রথমে গেলাম অমলবাবুর অফিসে। শুনলাল তিনি নেই, বেরিয়ে গেছেন। গেলাম তোমার বাড়ী। ঠাকুর বললে, একটি বাবুর সঙ্গে তুমি বেরিয়েছ। বর্ণনা শুনে মনে হল বাবুটি অমলবাবু হওয়াই সম্ভব। ভাবলাম, তোমরা বোধহয় ক্লাবে এসেছ। সেই থেকে এখানে অপেক্ষা করছি। কোথায় গিয়েছিলে?

সুমিত্রা বললে, অনেকদিন কলকাতা শহরকে দেখিনি। মনটা কেমন করছিল। একবার এদিক-ওদিক ঘুরে দেখে এলাম।

—কেমন দেখলে?

—পূর্ববৎ। আমরা ছিলাম না বলে আমাদের বিরহ-বেদনায় এতটুকু অধীর হয়নি।

কুণাল ঠোক্কর দিলে, নগরী আর নাগরী, তাদের ধারাই এইরকম।

খোঁচাটা দিয়েই কুণাল অমলের দিকে চেয়ে বললে, শুনেছেন জয়যাত্রার কাহিনী?

অমল বললে, শুনলাম বইকি। এমন কি, আমার কৃতিত্ব যে আপনি আত্মসাৎ করেছেন, তাও শুনলাম।

কুণাল হেসে বললেঃ একটি নাচের ভঙ্গী অমলবাবুর দেওয়া নয়, কুণালের দেওয়া। আচ্ছা বলুন তো, ওদের কাছে অমলবাবুতে আর কুণালে কোনো তফাত আছে? তারা কুণালকেও চেনে না, অমলবাবুকেও না। তারা একটিমাত্র ব্যক্তিকে চেনে, সে সুমিত্রা।

অমল বললে, যা বলেছেন! কথায় বলে, বৃন্দাবনে এক কৃষ্ণ, বাকি সবাই গোপিনী। দেখা যাচ্ছে, এমন বৃন্দাবনও আছে যেখানে এক রাধা, বাকি সবাই গোপবালক।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বললে, বলবেন না, বলবেন না! বাইরে কুণালকে তো দেখেননি অমলবাবু? ওর চালচলন ওঠে একেবারে ডিউক-অব-এডিনবরার কোঠায়।

অমল বললে, তথাপি আপনি হলেন হার-ম্যাজেষ্টি-দি-কুইন। আদর অভ্যর্থনা সবই আপনার জন্য।

উপমাটা শুনে সুমিত্রার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। চেষ্টা করেও জুৎসই একটা জবাব দিতে পারলে না।

শুধু বললে, আহা!

কুণাল খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, অমলবাবু, বম্বের আর কোনো খবর আছে?

অমল বললে, না। তবে প্রস্তুত থাকুন, পূজা আর দেয়ালী সংখ্যার জন্যে বম্বে আর কলকাতার অনেক কাগজ সুমিত্রাদির ফটোগ্রাফ চাইবে।

কুণাল লক্ষ্য করলে, অমলও সুমিত্রাদি বলছে।

সুমিত্রা লাফিয়ে উঠলঃ ওঃ! অটোগ্রাফ! আবার শুধু নাম-সই করলে হবে না। তার সঙ্গে দু'লাইন কবিতাও লিখে দিতে হবে। অমল, তুমি কবিতা লিখতে পার?

কুণাল লক্ষ্য করলে সুমিত্রা অমল বলছে।

বললে, সুমিত্রাদি, তোমার জন্যে উনি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারেন। কবিতা তো সামান্য জিনিস।

সুমিত্রা আবার লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

অমল হাসলেঃ চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—দেখ তো। এক ডজন দু'লাইনের বেশ ভালো কবিতা লিখে দিয়ো তো। মুখস্থ করে রাখব অটোগ্রাফ-শিকারীদের জন্যে। তা ছাড়া উপায় নেই।

অমল জিজ্ঞাসা করলে, কিরকম কবিতা চাও? প্রেমের?

—না, না। ছ'টা গুরুগম্ভীর,—বড় মেয়েদের জন্যে। বাকি ছ'টা হাসির,—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে। নইলে বাইরে বেরুনো অসম্ভব।

অমল ভরসা দিলে, দেখব।

কুণাল কাজের কথায় এলঃ তাহলে ছবি কি কিছু তুলে রাখব অমলবাবু?

—কিছু। কারণ কলকাতার কাগজওয়ালারা নিজেদের ফোটোগ্রাফার দিয়ে নিজেদের পছন্দমতো ছবি তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু বম্বেওয়ালাদের তো ··

—না, সে সুবিধা নেই।

—হাঁ। আর, এক ছবি দু'জায়গায় পাঠাবেন না। ওতে ওরা বিরক্ত হয়।

—বুঝলাম।

হঠাৎ অমল বললে, ভালো কথা, সুমিত্রাদি, তুমি একটা বাগান-

বাড়ির কথা বলেছিলে। তখন পাইনি। এখন পাওয়া গেছে একটা। ত্রিশ বিঘে জায়গার ওপর ছোট্ট একখানা দোতলা বাড়ি। সব সময় তার ছায়া নাচছে সামনের মস্তবড় পুকুরের জলে। যাবে ?

—না।

—সখ মিটে গেল ?

সুমিত্রা হেসে বললে, সখ নয়, প্রয়োজন মিটে গেছে।

ব'লেই যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

অপূর্ব চলে যাওয়ায় সুমিত্রা যেন হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচল। সে সুনিশ্চিত, অপূর্ব এ-বাড়ি আর আসছে না। গোলমাল অপূর্ব সহ্য করতে পারছে না। এ-বাড়ি অবশ্য শান্ত। সুমিত্রা থাকেনা বললেই চলে। ঠাকুর-চাকরও জোরে কথা বলে না। তবু কলকাতা শহরের হট্টগোল কে থামাবে ?

এ-কথা ঠিক না, বাইরে যাওয়ার মতলবটা সুমিত্রাই যুগিয়েছে। সে নিজে বাইরে যেতে চেয়েছিল। কথাটা অপূর্বর মনে লেগেছিল। কিন্তু সুমিত্রার বাইরে যাওয়া নয়, নিজের বইরে যাওয়া।

সুমিত্রা হট্টগোল পছন্দ করে। হট্টগোল ছাড়া সে থাকতে পারে না। যতক্ষণ জেগে থাকবে তাকে ঘিরে একটা হট্টগোল চাই। বহুজনের সঙ্গ, বহুজনের স্তুতিবাদ।

সুতরাং সে কেন যাবে ?

তার চেয়ে অপূর্বরই যাওয়া উচিত। তার নিজের জন্যেও বটে, সুমিত্রার জন্যেও বটে।

ইতিমধ্যে তার একটি উকিল বন্ধু এল।

বললে, এইখানে এসেছিলাম একটি মক্কেলের কাছে। তার একটি বাগান-বাড়ি বিক্রি আছে সেই সম্পর্কে।

বাগান-বাড়ির নামে অপূর্ব লাফিয়ে উঠল: কোথায় সেই বাগান-বাড়ি ?

—বরানগরের কাছে গঙ্গার ধারে।

বন্ধুটি বাগান-বাড়ির বিস্তৃত বিবরণ দিলে।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করলে, কত দাম চায় ?

—কেন বল দেখি ? খদ্দের আছে ?

—আমি নিজেই কিনতে চাই।

বন্ধুটি বললে, ভালোই হল। ভদ্রলোকের অত্যন্ত টাকার দরকার। তুমি তাড়াতাড়ি নিতে পারবে ?

—কাল নিতে পারি, যদি দর খুব বেশি না হয়।

বন্ধুটি বললে, তুমি নিজে যদি নাও, আমি সস্তাতেই করে দোব।

তাই হল। সস্তাতেই হয়ে গেল। এবং খুব তাড়াতাড়ি দলিল রেজেস্টারি হল।

এসমস্ত কথাবার্তা সুমিত্রা কলকাতায় থাকতেই হয়েছিল। বাড়ির কিছু মেরামত করার ছিল। তাড়াতাড়ি সেসমস্তও হয়ে গেল। বাইরে থেকে ফিরে এসে সুমিত্রা দেখলে, অপূর্ব বাগান-বাড়িতে উঠে গেছে।

একটু ক্ষুণ্ণ হল, এসবের কিছুই সুমিত্রা জানে না। খুশিও হল—সে একটু হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচল।

অপূর্ব তার কোন কাজে কখনও বাধা দেয়নি। কখনও রাগ-রোষ-কলহ করেনি। তার ধারে-কাছেও পারতপক্ষে আসত না। তবু, কি জানি কেন, যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো সুমিত্রার বুকের উপর বসে ছিল।

সুমিত্রা ঘর-দোরের অন্যরকম ব্যবস্থা করল।

নিচের ঘর যেমন ছিল তেমনি রইল। উপরের প্রশস্ত হল্‌ঘরটা আরও কয়েকটা সোফা-সেট দিয়ে আরও ভালো করে সাজালে।

শোবার ঘরটায় (যেটা ইদানিং সে পরিত্যাগ করেছিল এবং যেটায় অপূর্ব থাকত অপর্ণার ছবি নিয়ে) আবার সে ফিরে এল। সেটা হালকা করে নিজের জন্যে সাজালে। অন্য ঘরগুলো অবশ্য যথাযথ রইল।

এখন তার বন্ধুবান্ধব আর নিচে বসে না। সবাই চেনা হয়ে গেছে। সবাই সটান উপরে উঠে আসে। এবং রিহার্সালের সময় ছাড়া কল-কাকলীর দলের আড্ডা বেশির ভাগই উপরের হল্‌ঘরে বসে।

চা, পান, সরবত আর খাবার।

ঠাকুর-চাকর অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

ঠাকুর বলে, জানিস রামীর মা, রামধনটা চালাক আছে, বাবুর সঙ্গে গিয়ে বেঁচেছে। গেরস্ত-বাড়িতে এত হট্টগোল, এ তো আর চোখে দেখা যায় না!

রামীর মা বলে, চোখে দেখতে না পারলে চলে যাও।

—তাও যে পারি না। কুড়ি বছর এখানে চাকরী করছি, যাব বললেই কি যাওয়া যায়?

—তাহলে চোখ বুঁজে চাকরী করে যাও।

ঠাকুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে, তুই নতুন এসেছিস, পট্ করে বলে গেলি। আমি গিন্নিমার আমলের লোক। তখন কী দিন যে ছিল, সে তো তুই দেখিসনি। বাবুর পেথম পক্ষের বৌকেও দেখিসনি। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-পিতিমে। সেসব দিন আর ফিরবে না রে! ভাবতেও কষ্ট হয়। এত বড় বাড়ি, দেখতে দেখতে কি যেন হয়ে গেল!

ঠাকুর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

॥ আঠারো ॥

সকাল সাতটার মধ্যে এসে গেল কুণাল।

—সুমিত্রাদি !

—এস, এস।—সুমিত্রা সাদরে তাকে অভ্যর্থনা জানালে,—এত সকালে ! খবর আছে নাকি ?

খবর আছে। কুণালের চাল-চলন ভারী। টিপে টিপে কথা বলছেঃ টেলিগ্রাম এসে গেছে। ইম্প্রেসারিও আজ বিকেলের প্লেনে কলকাতা পৌঁছুচ্ছেন।

—আমাদের দাবীতে রাজি হয়েছে ?

—না হলে, আসছে কেন ! হয়তো আরও একটু দরদস্তুর করবে। সাত দিনের প্রোগ্রাম।

অনন্দে সুমিত্রা উসখুস করে উঠঃ সাত দিনের !

—মনে হয়, ভিড় হবে। পয়সা ওঠার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা না থাকলে একসঙ্গে সাতদিনের প্রোগ্রাম করত না।

—বম্বেতে তো পয়সার অভাব নেই।

—না। কিন্তু সখের অভাব আছে কিনা, গেলে টের পাব। কুণাল হাসতে লাগল।

বললে, কিন্তু টাকা বাঁচছে না তো। একদিক দিয়ে আসছে, অন্যদিক দিয়ে যাচ্ছে।

সুমিত্রা বললে, বাঁচিয়ে কি করবে ?

—ইচ্ছে আছে একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। কলকাতার বাইরে একটা বাগান-বাড়ি অন্তত ভাড়া নিয়ে 'কল-কাকলী'কে সেখানে তুলে নিয়ে যেতে পারলে কাজ হত।

—কেন, এখানে অসুবিধা কি হচ্ছে ?

কুণাল বললে, অসুবিধা কিছু হচ্ছে না। কিন্তু বাইরে আরও সুবিধা হত। আমরা অনেকে ওখানেই থাকতে পারতাম। নৃত্য-গীতের জন্যে জীবন-উৎসর্গকারী একদল ছেলেমেয়ে। একটা আশ্রম যেখানে সকলে সাধনা করবে।

সুমিত্রা টিপে টিপে হাসছিল। বললে, তুমি দিনরাত এইসব স্বপ্ন ছাখো, না কুণাল?

—দেখি। তোমাকে মক্ষিরাণী করতে চাই। আমরা, শ্রমিক মৌমাছিরা, তোমাকে ঘিরে মধুচক্র রচনা করতে চাই,—'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান মধু নিরবধি'। তুমি স্বপ্ন ছাখো না, মক্ষিরাণী।

—দেখি। কিন্তু তোমার মতো এত সুন্দর করে নয়।

কুণাল বললে, ওটা তোমার বাজে কথা। তুমি ছাখো বলেই আমরা দেখি। আমাদের স্বপ্ন তোমাকে ঘিরে।

অমল এল : কী স্বপ্ন দেখছ?

সুমিত্রা হেসে বললে, দেখছি তোমাকে দিয়ে আর কোথায় ছবি ছাপানো যায়।

—ও। আমার বুঝি ওই কাজ?

কুণাল বললে, সুমিত্রাদি আমাদের মক্ষিরাণী। ওর কাজই আমাদের কাজ। সেই কাজ আমরা খুশিমনে করব, যে যা পারি।

উৎসাহের সঙ্গে ওর পিঠে একটা চাপড় দিয়ে অমল বললে, বাঃ এ তো কবির মতো কথা। সুমিত্রাদি তুমি আমাকে কবিতা লেখার ভার না দিয়ে কুণালকে দিলে পারতে। ওর পেটের মধ্যে কবিতা গজগজ করছে।

সুমিত্রা বললে, আর চোখের মধ্যে স্বপ্ন। অমল, বম্বে থেকে ইম্প্রেসারিও আজ বিকেলের প্লেনে আসছে। শুনেছ?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তোমাকে আমাদের সঙ্গে এবারে যেতে হবে। 'না' বললে, শুনছি না।

অমল বললে, যাব। ভাবছি, শেষে নাচতে না লাগিয়ে দাও।

কুণাল বললে, যা বলেছ! সে আশঙ্কাও আছে। সুমিত্রাদি শুধু নাচে না, নাচায়ও।

ইতিমধ্যে একে একে আরও অনেকে এসে গেল।

সবাই বললে, দেখেছেন না, কী নাচনটা আমাদের নাচাচ্ছে? দিনরাত নাচিয়ে বেড়াচ্ছে!

সুমিত্রা প্রতিবাদ করলে: বাজে কথা বোল না। কে যে কাকে নাচাচ্ছে সেটা প্রমাণ হতে বাকি আছে।

একটি মেয়ে হাত নেড়ে বললে, বাকি কিছু নেই। তুমি আছ তাই 'কল-কাকলী' আছে। 'কল-কাকলী' আছে তাই আমরা আছি। তোমার জন্যে সব।

সুমিত্রা বললে, না। তোরা আছিস তাই 'কল-কাকলী' আছে। 'কল-কাকলী' আছে তাই আমি আছি। নইলে কিসের কি! বুঝলি?

কুণাল বললে, আজ বিকেলে ইম্প্রেসারিও আসছে। সন্ধ্যায় সব ক্লাবে আসবে।

—কেন? উনি কি নাচ দেখবেন নাকি?

—বোধহয়, না। ওরা নাচের চেয়ে চেহারা বেশি বোঝে। দেখবে, যারা যাবে তাদের চেহারা কিরকম।

মেয়েরা সবাই ছিঃ ছিঃ করে উঠল।

কুণাল হেসে বললে, ছিঃ ছিঃ করলে কি হবে। ওরা মুখে সে-কথা বলবেনা বটে, কিন্তু মনের মধ্যে সেই কথাটাই রয়েছে। আমাদেরও ভাব দেখাতে হবে যেন ওদের মনের কথাটা বুঝি না। না কি বল অমল?

অমল বললে, সুরের সঙ্গে অসুরের যুদ্ধ নিত্যকাল থেকে চলে

আসছে। অথচ, আশ্চর্য ছ্যাখো, সুরেরও অসুর নইলে চলে না, অসুরেরও সুর নইলে !

সুমিত্রা বললে, বাঃ ! কথাটা চমৎকার বলেছ।

বেলা একটা পর্যন্ত আড্ডা চলল।

কারোই তো কোন কাজ নেই। সকলেরই হাতে অঢেল সময়। সত্যিকথা বলতে কি, অপূর্ব চলে যাওয়ায় শুধু সুমিত্রার নয়, এদের সকলেরই সুবিধা হয়েছে। সকালের আড্ডাটা এতদিন ক্লাবে চলত। কিন্তু নানা কারণে সেটা ক্লাবের চেয়ে এখানেই জমেছে ভালো। ওরা কেউ এসে আর উঠতে চায় না।

সবাই যখন উঠল, তখন সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, বিমান-ঘাঁটিতে ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করবার জন্যে কে কে যাচ্ছে ?

কুণাল বললে, আমি তো যাচ্ছি-ই।

অমল বললে, আমিও যেতে পারি।

সুমিত্রা বললে, বেশ। তোমরা ছুজনেই যাও। আমার ড্রাইভার তোমাদের বাড়ি চেনে। চারটেয় তোমাদের তুলে নিয়ে যাবে। না আরও আগে যাবে ?

—চারটেয় গেলেই হবে।

—তাই হবে। তোমরা তৈরি থেক। কোথায় উঠবেন ভদ্রলোক ?

ওরা একটা বিলিতি হোটেলের নাম করলে।

সুমিত্রা বললে, বেশ। ওঁকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে তোমরা ছুজনে এখানে আসবে। এখান থেকে ক্লাবে যাব। না, কথাবার্তা আমার এখানে হবে ?

ওদের ক্লাবের ফ্ল্যাটটা অন্তত আসবাবপত্রের দিক দিয়ে যথেষ্ট অভিজাত নয়। ভেক নইলে ভিক মেলে না। সেই কথা বিবেচনা করে সবাই বললে, এখানে আনাই ভালো।

সুমিত্রা বললে, বেশ তাই হবে। কিন্তু কথাবার্তা নিচের ড্রইং-রুমে হবে।

—তা হতে পারে।

অন্য সকলের দিকে চেয়ে সুমিত্রা বললে, তোমরা তাহলে ছ'টার মধ্যে এখানে আসবে।

সকলে রাজি হয়ে চলে গেল। শুধু বাসন্তীকে সুমিত্রা আট্‌কালে। সকলেই জানে কেন আট্‌কালে।

এই মেয়েটি অল্প দিন হল এসেছে। অত্যন্ত দুঃখী মেয়ে। বাড়িতে অন্ধ বাপ আর মা। ভাইগুলি ছোট ছোট। সমস্ত সংসার তার উপর। বলতে গেলে পেটের দায়ে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে জুটেছে।

মেয়েটির মুখখানি বেশ চমৎকার। অঙ্গসৌষ্ঠবও সুন্দর। নাচতে যে বিশেষ জানত তা নয়, কিন্তু শেখবার আগ্রহটা ছিল। সুমিত্রা ওকে গড়ে-পিটে নিলে। এখন 'মদন-ভস্মে' বাসন্তী 'রতি'র পার্ট করে। ভালোই করে।

এখানকার আড্ডায় সব দিন ও আসতে পারে না। দূরে থাকে। বোধহয় আরও কিছু করে। কিন্তু যেদিন আসে, সুমিত্রা ওকে আট্‌কায়। দুপুরে দুজনে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে। কাজ থাকলে, বিকেলে ছেড়ে দেয়। নয়তো সন্ধ্যার সময় ক্লাবে নিয়ে যায় রিহার্সালের জন্যে।

মাঝে মাঝে দু'পাঁচ টাকা সাহায্যও করে।

—বাসন্তী, স্নান করবি নাকি?

বাসন্তী স্নান করেই বেরিয়েছিল। কিন্তু স্নান করার একটা লাভ আছে। স্নান করতে গেলই সুমিত্রা একখানা শাড়ি বের করে দেবে। সেটা আর ফেরত দিতে হবে না।

বললে, করলে ভালো হত।

ড্রয়ার থেকে একখানা শাড়ি বের করে দিয়ে সুমিত্রা বললে, তাহলে যা। তাড়াতাড়ি স্নান করে আয়।

বাসন্তী স্নান করে আসতে তুজনে এক টেবিলে খেতে বসল।

ওকে খাওয়াতে সুমিত্রার খুব ভালো লাগে। ও তার দলের অন্য মেয়েদের মতো নয়। এটা একটু, ওটা একটু চেখে উঠে পড়ে না। তৃপ্তি করে খায়। মন দিয়ে খায়। সুমিত্রা চেয়ে ছাখে কোন্‌টা ওর ভালো লাগছে। সেই জিনিসটি ঠাকুরকে আবার দিতে বলে। 'না' বললেও শোনে না।

ভালো-মন্দ জিনিস বাসন্তী বড়-একটা খেতে পায় না। খেতে ইচ্ছা করে, কিন্তু লজ্জাও করে। কিন্তু সুমিত্রার বড়দিদির মতো সতর্ক দৃষ্টির সামনে লজ্জা করতে পায় না।

সুমিত্রা বললে, তুই আছিস বলে আমিও তুটি পেট ভরে খেলাম। একা খেতে মোটে ভালো লাগে না।

বাসন্তী হেসে বললে, জামাইবাবুর সঙ্গে খেলেই পারেন।

—তিনি তো এখানে থাকেন না।

বাসন্তী চমকে উঠল। সে আসে-যায়, অত খবর রাখে না। জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় থাকেন?

—বাগান-বাড়িতে।

—একা?

—না। একটা চাকর থাকে। দারোয়ান আছে।

—খাওয়া-দাওয়া?

—এখান থেকে যায়।

—মোটরে?

—হ্যাঁ।

বাসন্তী হেসে বললে, আপনি সেই মোটরে গিয়ে একসঙ্গে খেলেই তো পারেন।

সুমিত্রা হেসে বললে, অত পারি না।

কেন পারেনা সে-কথা বাসন্তীকে বলা যায় না।

জিজ্ঞাসা করলে, বাসন্তী, তুই দুপুরে ফিরতে পারলি না, তোর বাপ-মা ভাববেন না?

—না। এমন মাঝে মাঝে হয়। ওঁরা জানেন।

দুঃখী মেয়ে, যাদের খেটে খেতে হয়, তাদের যাওয়া-আসার সময় ঠিক থাকে না। হয়তো অনেকদিন খাওয়াও হয় না। বাবা-মা কত ভাববেন? আর ভাবেন না।

বললে, যেদিন ফিরতে দেরী হবে এখানে আসিস। কেমন?

মুখ নামিয়ে বাসন্তী বললে, আচ্ছা।

স্নেহের স্পর্শে তার চোখে জল এসেছিল বোধ হয়, তাই চোখ তুলতে পারলে না।

সন্ধ্যাবেলায় কুণাল এবং অমল ইম্প্রেসারিওকে সঙ্গে করে সুমিত্রার বাড়ি নিয়ে এল।

লোকটির বয়স চল্লিশের মধ্যে। পরনে মূল্যবান ইংরাজী স্যুট। হাতের ঘড়িটিও দামী। লোকটিকে মনে হয় খুব ধূর্ত। চোখ সব সময় চারিদিকে ঘুরছে। মুখে বড় বড় কথার তুবড়ি-বাজি। এসেই বসবার ঘরখানি চট করে দেখে নিলে। বুঝলে, বাড়ির অধিকারীর অর্থ আছে, রুচিও আছে। ঘর অনাবশ্যক আসবাবপত্রে বোঝাই নয়। দেওয়ালে অল্প কয়েকখানি বাছাই-করা ছবি। মাঝখানে টিপয়ের উপর ফুলদানিতে একটি সুন্দর তোড়া। ব্যস্।

কুণাল পরিচয় করিয়ে দিলে, ইনিই সুমিত্রা দেবী।

নমস্কার বিনিময় করার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি দেখে নিলে সুমিত্রার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি দৃষ্টিপাতে। দেখে নিলে মাথার চুল

এলোখোঁপা করে বাঁধা। মুখে হালকা প্রসাধন। পরনে হালকা রঙের একখানা শাড়ি। বেশভূষা নিতান্ত সাধারণ, বাহুল্যবর্জিত, কিন্তু পরিচ্ছন্ন।

সুমিত্রার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ভদ্রলোক এক ফাঁকে চেয়ে নিলে সমস্ত দলটির দিকে, বিশেষ করে সমবেত মেয়েদের দিকে।

মন্দ হবে না। মেয়েগুলি দেখতে ভালো।

এ নিয়ে সকালেই এক প্রস্থ আলোচনা হয়ে গেছে। এই দৃষ্টির জন্যে সকলেই অল্পবিস্তর প্রস্তুত ছিল। দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই অন্যমনস্ক হল।

লোকটি দেখে-শুনে খুশি হল বলেই মনে হল।

বললে, সুমিত্রা দেবী, বম্বে আপনাকে চেনে। আপনার ছবির মারফত বম্বের দর্শকদেরও আপনার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। কাগজে আপনার সম্বন্ধে পড়েছেও কিছু কিছু। সেদিক দিয়ে ঝামেলা নেই। লেকিন দর কিছু বেশি হেঁকেছেন। সে ভি আচ্ছা। তা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। এখন বাৎ হচ্ছে, আপনারা সমস্ত দলের জন্যে প্লেনের ভাড়া চেয়েছেন। আমি বলি, ট্রেনের ভাড়া নিন। খালি সুমিত্রা দেবী আর একজনের জন্যে প্লেনের ভাড়া নিন।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বললে, সে হয় না। সবাই যদি ট্রেনে যায় আমিও ট্রেনে যাব।

লোকটি একগাল হেসে বললে, উ তো আউর ভি আচ্ছা। লেকিন আমার পয়েণ্ট হচ্ছে আপনারা বম্বেতে নতুন যাচ্ছেন। নতুনের সুবিস্তা আছে, অসুবিস্তা ভি আছে। আমি একদম আঁধিয়ারে ডুব দিচ্ছি। আমার কথাটা ভাববেন।

কুণাল বললে, কি ভাবব বলুন?

লোকটি হাতজোড় করে বললে, দেখবেন, আমার লোকসান যেন না যায়।

বলে ওর ফোলিও-ব্যাগ থেকে একটা টাইপ-করা কনট্রাক্ট-ফর্ম বের করলে।

বললে, এই আমাদের কনট্রাক্ট-ফর্ম। এটা দেখে রাখবেন। দরকার হলে আপনাদের অ্যাটর্নীকেও দেখাতে পারেন। পরশু এটা স্ট্যাম্প-কাগজে সই হবে। আমি পরশুই ফিরে যেতে চাই।

সুমিত্রার মুখ শুকিয়ে গেল। উকিল-অ্যাটর্নী স্ট্যাম্প-কাগজ এসব আবার কি? মুখে মুখে কথা হয়েছে, অর্ধেক টাকা অগ্রিম নিয়েছে, চলে গেছে। এরকম লেখাপড়া তো কখনও হয়নি!

সে শুষ্কমুখে কুণালের দিকে চাইলে।

কুণাল হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিলে। বললে, ঠিক আছে। আমরা কাল আমাদের অ্যাটর্নীর কাছে পাঠিয়ে দোব। বিকেলে আপনি এখানে এলে আমাদের মতামত জানিয়ে দোব।

—বহুৎ আচ্ছা। নমস্তে।

লোকটি চলে গেল।

সে চলে যেতে, সুমিত্রা ভয়ে ভয়ে কুণালের হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিলে। *WHEREAS* দিয়ে সুরু করা একখানি খসড়া।

বললে, কী সর্বনাশ। শেষে কি মামলা-মোকর্দমায় জড়িয়ে পড়ব নাকি?

কুণাল হো-হো করে হেসে উঠল: সুমিত্রাদি, আমরা কানপুর যাচ্ছি না, যাচ্ছি বম্বে। সাতদিনের প্রোগ্রাম। আমাদের নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্যেই পাকা চুক্তি দরকার।

সুমিত্রা বললে, যা করবার কর। আমার তো ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

কুণাল বললে, কারও জানা অ্যাটর্নী কেউ আছে?

কারও নেই।

কুণাল বললে, সন্ধান করতে হবে। তার আগে নিজেরা একবার পড়া যাক ব্যাপারখানা কী।

কুণাল পড়তে লাগল, আস্তে, আস্তে, প্রত্যেকটি শব্দের উপর জোর দিয়ে, ভাষার জটিলতায় যেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে সেটা দুবারের উপর তিনবার প'ড়ে।

ধীরে ধীরে আইনের ভাষা সড়গড় হতে লাগল। প্রথমে যতখানি ভয় হয়েছিল, ক্রমে তা দূর হতে লাগল। প্রথম দিকের কয়েকটি প্যারাগ্র্যাফ পড়া হতে দেখা গেল, চুক্তিটাকে যত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল তত ভয়ঙ্কর নয়। এর আবশ্যক ছিল।

সাহস পেয়ে সুমিত্রা আরো এগিয়ে এল।

একটার পর একটা সর্ত। অনেকগুলি মামুলি। কিছু কিছু কাজের। সেগুলি আগেই উভয়পক্ষের সম্মতি লাভ করেছিল। কিছু নতুন। সেগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করা দরকার। সেগুলির পাশে একটা করে সংকেত চিহ্ন রাখা হল।

কুণাল পড়ে চলে। সকলে মন দিয়ে শোনে। আপত্তি থাকলে বলে। পাশে নোট করা হয়। আবার পড়া চলে।

অবশেষে শেষ সর্ত :

যদি 'কল-কাকলী' চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে 'শো' দিতে না পারে তাহলে তাকে একটা মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

অমল বললে, থামো, থামো। আর একবার পড় তো ওই অংশটা।

কুণাল আবার পড়লে।

অমল বললে, দাঁড়াও। এটা নিয়ে বিবেচনা করবার আছে।

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল : এ নিয়ে আর বিবেচনা কি ? আমরা তো যাবই। যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বসে আছি। না-যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ওটা একটা মামুলি সর্ত।

অমল বললে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দৈবাতের কথা তো বলা যায় না। তার একটা ফাঁক রাখা দরকার। আমি বলি,

সবাই ওর মুখের দিকে উৎকণ্ঠ চেয়ে রইল।

অমল আপন মনে ভাবে।

অবশেষে বললে, যেখানে লেখা আছে "চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে 'শো' দিতে না পারে", তার আগে বসিয়ে দাও "উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে"।

বাঃ! চমৎকার!

কুণাল বললে, অমল, তোমার উকিল হওয়া উচিত ছিল।

অমল হেসে বললে, সেটাও পাস করা নেই ভেবেছ?

—তবে? ছলনা করে সিনেমার কাগজে রয়েছ কেন? কোর্টে বেরিয়ে পড়। যেরকম দেখছি, আমাদের এখন ঘন ঘন উকিলের দরকার হবে।

অমল হেসে বললে, তা তো আগে জানা ছিল না। তাহলে আর এ ঝকমারি করতাম না।

কুণাল বললে, এখন কি করব বল। অ্যাটর্নী-বাড়ি যাওয়ার দরকার হবে?

সুমিত্রা বললে, হবে। অন্তত ভালো একজন উকিলের পরামর্শ নেওয়া। কিছু ফি লাগে, দেওয়া যাবে। কি বল অমল?

—নিশ্চয়। এ স্বেচ্ছাসেবকের কাজ নয়।

সেইরকমই স্থির হল। কাল সকালে কুণাল এবং অমল তুজনেই কোনো অ্যাটর্নী অথবা উকিলের বাড়ি যাবে। ফিরে এসে সুমিত্রাকে সব জানাবে।

॥ উনিশ ॥

রাত্রে আহারাদির পর সুমিত্রা শুতে যাবে, রামধন এসে দাঁড়াল। মুখখানি ম্লান। কিছুক্ষণ আগেই সে এসেছে। সুমিত্রার খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল।

অপূর্ব বরাহনগরের বাগান-বাড়িতে চলে যাওয়ার পরে রামধন একদিনও আসেনি। অথবা যদি এসেও থাকে, সুমিত্রার সঙ্গে দেখা হয়নি। বোধহয় সময় পায়নি, ভাবলে সুমিত্রা। কাজকর্ম সেরে আজ একটু সময়ে এসেছে বোধ হয়।

জিজ্ঞাসা করলে, কি রে রামধন? ওখানে আছিস কেমন?

—আজ্ঞে, ভালো নয়।

—কি হল? মশা?

রামধন বিষণ্ণকণ্ঠে বললে, আজ্ঞে, মশা নয়। পেথম-পেথম গিয়ে ভালোই ছিলাম। আজ বিকেল থেকে বাবুর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

—কি হয়েছে? জ্বর?

—আজ্ঞে, জ্বর নয়। কাল বিকেলে চারটের সময় একবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

—তারপরে?

—চোখে-মুখে জল দিয়ে পাখার বাতাস করতে জ্ঞান হল। খাওয়া-দাওয়া করে বাবু শুলেন। আমিও দরজার বাইরে একটা বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। রাত্রে মাঝে মাঝে উঠে দেখলাম, বাবু ঘুমুচ্ছেন।

সুমিত্রা বললে, তবে আর কি।

—আজ্ঞে না। রাতটা ভালো ছিলেন। আজকের দিনটাও ভালোই ছিলেন।

সুমিত্রা বললে, ওটা ফিট। এমন ভয়ের কিছু নয়। দিনরাত ছবির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শরীরটা রুক্ষ হয়েছে। ভালো করে স্নান করতে বল্‌, খেতে বল্‌, নিশ্চিন্তে ঘুমুতে বল্‌, আপনিই সেরে যাবে।

রামধন করজোড়ে বললে, আজ্ঞে আমিও তাই ভেবেছিলাম। সকাল দুপুর দু'বার বেশ ভালো করে স্নান করানো হল। খাওয়া এমনিতেই কম, এখন একেবারেই কমে গেছে। তাও আজ জোর করে কিছু খাইয়েছি। দুপুরে ঘুমিয়েছেনও বেশ খানিকটা। কিন্তু বিকেলে আবার অজ্ঞান হলেন।

সুমিত্রা আশ্বাস দিয়ে বললে, কোনো অসুখ একদিনে কি সারে রে! রাত্তিরটা দেখবি ভালোই থাকবেন।

—আজ্ঞে না। আটটার সময় আবার হয়েছিল। সেইজন্যেই ভয় পাচ্ছি।

একটুক্ষণ চিন্তা করে সুমিত্রা বললে, অনেকদিনের ধ্যান-ধারণার জিনিস! এত সহজে কি যাবে? ডাক্তার ডেকেছিস?

—আজ্ঞে না। ওদিকে কি আছে না-আছে কিছুই তো জানা নেই

সুমিত্রা বললে, ডাক্তার না-থাকা কি হয়। কাছাকাছি কোথাও আছে নিশ্চয়। পাশের লোকজনকে জিগ্যেস কর্‌, ভালো ডাক্তার কোথায় থাকেন। তাঁকে খবর দে। ভয় পাস্‌নে, ওই ধ্যানধারণাটা কিছুদিন বন্ধ রাখলেই সেরে যাবে।

—আজ্ঞে।

—তুই এলি কি করে?

—বাবু একটু সুস্থ হতে, দারোয়ানকে তাঁর কাছে রেখে, আমি গাড়ি নিয়ে চলে এলাম আপনাকে খবর দিতে।

সুমিত্রা বিরক্তভাবে বললে, আমাকে খবর দিয়ে কি হবে রে বোকা, তার চেয়ে ডাক্তারকে খবর দিলে ভালো করতিস। তুই যখন এলি তখন বাবু কি করছেন?

—তখন দুধটুকু খেয়ে ঘুমুচ্ছেন।

—ব্যস্ আর তাঁকে বিরক্ত করিস না। কালকের মতন দরজার বাইরেই শুবি। সকালে একটি ভালো ডাক্তার ডাকবি। তিনি কি বলেন আমাকে জানাবি। ওদিকে কারও টেলিফোন আছে?

—তা জানি না, মা।

—যদি থাকে, সেখান থেকে ফোনে আমাকে একটা খবর দিবি।

—যে আজ্ঞে।

রামধন আর দাঁড়াল না। অনেকক্ষণ অপূর্বকে একা রেখে এসেছে। মনটা ছটফট করছিল।

নিচে সিঁড়ির কাছে ঠাকুর তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে কি হল?

—কাল সকালে ডাক্তার ডাকতে বললেন।

—গেলেন না?

—না।

ঠাকুর বললে, তুই মিথ্যে এসেছিলি, রামধন। আমি জানতাম উনি যাবেন না। বাড়িতে এমন জমাটি আড্ডা। একদল ছেলেমেয়ে দিনরাত্তির নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।

—এই বাড়িতে?

—আর কোথায়? এ বাড়ি তো এখন হোটেলখানা হয়েছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা-বিস্কুট-খাবার। আজ সন্ধ্যেয় এক বোম্বাইওয়ালা সাহেব এসেছিল। কী তার খাতির!

রামধন অবাক: বলেন কি! এই বাড়িতে?

—এই বাড়িতে রে, এই বাড়িতে। এখন আর সদর-অন্দর নেই। মদ্দ মদ্দ জোয়ান হুট-হুট করে উপরে চলে যাচ্ছে। যত ছেলে তত মেয়ে। ওপরের হলঘরটা দেখে আয় কী সাজানোর বাহার! যেন রাজসভা। সকাল থেকে লোক আসতে আরম্ভ করে, একটা অবধি চলে।

রামধনের মুখে কথা নেই। শুধু চোখ বড় বড় করে শুনছে।

ঠাকুর বলে চলল: এ-বাড়ির আর ভাখ্যি নেই, রামধন। পাড়ার লোক সব ছি-ছি করছে। তুই বেঁচে গেছিস রামধন, কিন্তু আমি তো আর পারি না! আমাকে কোনো-রকমে ও-বাড়ি নিয়ে যেতে পারিস? লক্ষ্মী ভাই! আমাকে বাঁচা।

ঠাকুর রামধনের হাত দুটি চেপে ধরল।

রামধন বললে, বাবুর গতিক-সতিক আমার ভালো লাগছে না, ঠাকুরমশাই। কাল ডাক্তার তো ডাকি। দেখি তিনি কি বলেন। তারপরে ওসব কথা হবে। অনেকক্ষণ বাবু একা আছেন। আমার মন ছটফট করছে। আমি যাই।

—মন আমারও ছটফট করছে রে! কাল সকালেই খবরটা দিস।

—দোব।

বলে রামধন ব্যস্তভাবে চলে গেল।

সকালেই অমলকে নিয়ে কুণাল এল।

কুণাল বললে, একটি জানা অ্যাটর্নীর খোঁজ পেয়েছি। আমরা সেইখানেই যাচ্ছি।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, টাকা-কড়ি সঙ্গে নিয়েছ তো?

—নিয়েছি। তোমার গাড়িখানা দাও। এখন যাব অ্যাটর্নী-বাড়ি। সেখানে কতক্ষণ হবে জানি না। সেখান থেকে যাব ইম্প্রেসারিওর হোটেলে। আমাদের যদি কিছু আপত্তি থাকে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হওয়া দরকার।

—নিশ্চয়।

সেখান থেকে আবার ছুটতে হবে অ্যাটর্নীর অফিসে। চুক্তিপত্র স্ট্যাম্প-কাগজে টাইপ করাতে হবে।

সুমিত্রা বললে, তার আগে এখানে একবার আসবে না?

কুণাল বললে, নিশ্চয়। তোমাকে একবার না দেখিয়ে নিয়ে অ্যাটর্নী-বাড়ি যাব না।

অমল জিজ্ঞাসা করলে, তোমাকে অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন সুমিত্রাদি? রাত্রে ঘুম হয়নি?

সুমিত্রা হাসল: ঘুম হবে না কেন?

অমল বললে, চুক্তিপত্র আর উকিল-অ্যাটর্নীর নাম শুনে ভড়কে যাওনি তো?

সুমিত্রা বললে, প্রথমটা গিয়েছিলাম। চুক্তিপত্র পড়া হতে অনেকটা সুস্থ হয়েছি। যা ভেবেছিলাম ততখানি ভয়ের কিছু নয়। তবু কি জান, দলিলপত্রের নামে ভয় লাগে।

—এখন আর ভয় নেই তো?

—আছে একটু।

কুণাল বললে, বম্বে থেকে নির্বিঘ্নে ফিরে আসার আগে সেটুকু বোধ হয় যাবে না।

সুমিত্রাও হেসে বললে, বোধহয় না। কিন্তু তোমরা আর দেরি কোর না। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।

ড্রাইভারকে ডেকে সুমিত্রা বলে দিলে।

ওরা চলে গেল।

সুমিত্রা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অমল ঠিকই বলেছে, মুখখানা শুকনোই দেখাচ্ছে বটে।

কলঘরে গিয়ে সুমিত্রা মুখখানা ঠাণ্ডা জলে বেশ ভালো করে ধুয়ে এল। ঘাড়, কানের পাশ, সমস্ত। ফিরে এসে স্নো মাখলে। আয়নায় দেখলে, এখন অনেকখানি ভালো দেখাচ্ছে, অনেকখানি সুস্থ।

শরীরটা ভালো নেই সত্যি। যেন স্ফূর্তি পাচ্ছে না।

কুণালেরা গেল, কখন ফিরবে কে জানে। ততক্ষণ কী করে যে কাটবে ঠিক নেই।

মেয়েগুলো এমন সময় এসে পড়ে, আজ আর কারও দেখা নেই। কেন বিলম্ব করছে কে জানে।

ঘড়ি দেখলে, মোটে সাড়ে সাতটা। এইবার আসবে।

সুমিত্রা খবরের কাগজ নিয়ে বসল। ভালো লাগল না। ঠাকুরকে ডাকলে।

—কি মা?

—বাজার এসে গেছে?

—অনেকক্ষণ।

—আমার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এস।

—যাই, মা।

সুমিত্রার শরীরটা কিছু দুর্বল বোধ হচ্ছে। মনের মধ্যে কেমন অস্বস্তি বোধ করছে। কি করলে সুস্থ হবে ভেবে পাচ্ছে না।

—ঠাকুর!

—যাই, মা।

—রামধন এসেছে?

—না, মা।

—কেউ টেলিফোনও করেনি?

—আমি তো নিচে, মা।

ঠাকুরের জানবার কথা নয়। টেলিফোনটা উপরে। ঠাকুর নিচে। তবু এর মধ্যে যদি কোনো সময় এসে থাকে যখন হয়তো সে ছিল না।

কুণালদেরও অনেক দেরি হবে। অ্যাটর্নী-বাড়ী যাওয়া, সেখানে চুক্তিপত্র পড়া এবং আবশ্যকীয় সংশোধন। তারপরে আবার ইম্প্রেসারিওর হোটেলে।

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকা সহজ নয়।

ওদের বলে দিলে হত, মোটামুটি কি স্থির হল, অ্যাটর্নী-বাড়ি

থেকে ফোনে জানিয়ে দিতে। অ্যাটর্নীর নামটাও জেনে নেওয়া হয়নি যে, সুমিত্রাই ফোন করে জেনে নেয়।

তাকে অপেক্ষা করতেই হবে ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত।

এর মধ্যে একটি ছুটি করে মেয়েরা আসতে আরম্ভ করল। যাক, কথা কইবার লোক পেয়ে সুমিত্রা বাঁচল।

—কি হল সুমিত্রাদি?

—কিসের?

—বম্বের ব্যাপারটার।

সুমিত্রা হেসে বললে, এর মধ্যে? কুণাল আর অমল গেছে অ্যাটর্নী-বাড়ি। সেখানে ঘণ্টাতিনেক। সেখান থেকে যাবে ইম্প্রেসারিওর হোটেলে। সেখানেও ধরো ঘণ্টা দুই ধ্বস্তাধ্বস্তি! ফিরতে একটার আগে নয়।

বাবাঃ!

—অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। ধৈর্য ধরতে শেখ। বম্বে তো এখানে নয় যে, গাড়িতে উঠব আর পৌঁছে যাব!

—সেই ভালো। অপেক্ষাই করি।

সোফাগুলি জুড়ে সবাই ভব্যযুক্ত হয়ে বসল।

গল্প সুরু হল:

—আচ্ছা সুমিত্রাদি, ফিরতে ক'দিন হবে?

সুমিত্রা হেসে ফেলল: যাওয়া কোথায় তার ঠিক নেই, এর মধ্যে ফেরার কথা ভাবছিস?

—না, তাই বলছি।

—ধরে রাখ্, দিন পোনেরো। যেতে আসতেই তো দুটো দিন। একদিন আগে যেতে হবে ট্রেনের ধকল কাটাবার জন্যে। তারপর অতদূর যাচ্ছি, দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখবার জন্যে যদি একটা দিন বেশি থাকতে হয়, থাকব না?

—নিশ্চয়।

টেলিফোনটা বেজে উঠল। সুমিত্রা উঠল।

হ্যালো!

আজ্ঞে আমি রামধন।

কি খবর?

সকালে বাবু ভালোই আছেন। তবে খুব দুর্বল বোধ করেছেন।

সেটা আর হয়নি তো?

আজ্ঞে না।

ডাক্তার এসেছিলেন?

আজ্ঞে না। ডাক্তার ডাকতে বাবু নিষেধ করছেন। বলছেন এখন ভালোই বোধ করছেন।

তাহলেও একবার ডাক্তার ডাকা উচিত ছিল। ব্যাপারটা কি জানা দরকার ছিল না?

কিন্তু উনি যে নিষেধ করছেন।

তাহলে থাক্।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিয়ে সুমিত্রা মেয়েদের কাছে এসে বসল।

তাদের চিন্তিত বোধ হল। রামধনের কথা তারা শুনতে পায়নি, কিন্তু সুমিত্রার মুখে ডাক্তারের কথা শুনে উদ্‌গ্রীব হল।

—ডাক্তার কি সুমিত্রাদি? কারও অসুখ-বিসুখ নাকি?

—না, এমন কিছু অসুখ নয়।

—কার?

একটু ইতস্তত করে সুমিত্রা বললে, আমার স্বামীর।

একসময় নিরিবিলি পেয়ে বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলে, বম্বে যাওয়া পিছিয়ে দিলে হয় না সুমিত্রাদি?

—কেন?—সুমিত্রা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

—আপনার স্বামীর অসুখ বললেন।

সুমিত্রা হেসে উঠল ঃ সে এমন কিছু অসুখ নয় যে, তার জন্যে বম্বে যাওয়া আটকাবে।

বাসন্তীর ভয় হয়েছিল। সুমিত্রার কথা শুনে আশ্বস্ত হল।

আবার টেলিফোন এল।

হ্যালো!

আমি কুণাল।

বল কি ব্যাপার? আমরা সবাই তোমার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

খবর ভালো।

কোথা থেকে ফোন করছ?

ইম্প্রেসারিওর হোটেল থেকে।

এখন কি এখানে ফিরছ?

না। অ্যাটর্নীর অফিসে যাব। সেইটে জানিয়ে দেবার জন্যেই টেলিফোন করা যে, আমাদের ফিরতে দেরি হতে পারে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আবার বলছি, খবর ভালো।

সুমিত্রা টেলিফোন নামিয়ে রেখে দিলে। ওদের দিকে চেয়ে বললে, ফিরতে দেরি হবে। খবর ভালো।

সবাই উঠে পড়ল। বললে, তবে আর কি! সন্ধে-বেলায় আসব বরং। কি বল?

ওরা চলে গেল।

॥ কুড়ি ॥

কুণাল এবং অমল যখন সুমিত্রার বাড়ী এল তখন দুটো বেজে গেছে। দুজনেই অত্যন্ত ক্লান্ত। বসতে চাইলে না।

শুধু বলে গেল, কয়েকটি জায়গা অ্যাটর্নী সংশোধন করে দেন। ইম্প্রেসারিও প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়েছেন। ওরা সেটা নিয়ে অ্যাটর্নীর অফিসে যায়। আজ আর আবশ্যকীয় স্ট্যাম্প-কাগজ কেনার সময় ছিল না। কাল প্রথমদিকেই সেগুলো কেনা হয়ে টাইপ করা হবে। তারপর দুটোর সময় সুমিত্রা আর ইম্প্রেসারিও তাতে সই দেবে।

—আবার আমাকে যেতে হবে অ্যাটর্নীর-অফিসে ?

—তুমি না গেলেও চলতে পারে। তাহলে অ্যাটর্নীর-অফিসের কেউ এসে তোমার সই নিয়ে যাবে।

অমল বললে, অবশ্য চুক্তিপত্র এখানে নিয়ে এসে এখানেই তোমার আর ইম্প্রেসারিওর সই করা চলে।

ব্যগ্রভাবে সুমিত্রা বললে, যদি চলে তাহলে তাই কর, অমল। আমাকে আর অ্যাটর্নীর বাড়ী টেনো না।

কুণাল বললে, প্রথম কারবার, মাঝখানে একজন অ্যাটর্নী থাকলে ভালো হত না ?

অসহিষ্ণুভাবে সুমিত্রা বললে, না না, কিছু ভালো হত না। আমি কোথাও যেতে পারব না।

ওরা অবাক হয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ওকে এত উত্তেজিত এবং অসহিষ্ণু আর কখনও দেখা যায়নি।

বললে, বেশ। তাই হবে। আমরা আর দাঁড়াতে পারছি না। এখন চললাম। বাড়ি পৌঁছে তোমার গাড়ি ছেড়ে দোব।

—আচ্ছা।

ওরা চলে যেতে সুমিত্রা আপনমনেই বললে, একটা নাচের চুক্তি, তার জন্যে আবার অ্যাটর্নী-বাড়ি যেতে হবে! যত সব বাড়াবাড়ি কাণ্ড!

একটু পরেই ড্রাইভার এসে জানালে, গাড়ি গ্যারাজে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন সে কি যেতে পারে?

সুমিত্রা তাকে উপরে ডেকে পাঠালে।

জিজ্ঞাসা করলে, তুমি খেয়েছ বাবা?

ড্রাইভার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। খাওয়া কারও হয়নি—কুণাল-অমলেরও না, ওরও না।

—স্নানও তো হয়নি?

ড্রাইভার চুপ করে রইল।

সুমিত্রা তাকে স্নান করে নিতে বললে। ঠাকুরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, ড্রাইভারকে দুটো খাইয়ে দিতে পারে কিনা?

ঠাকুর বললে, হয়ে যেতে পারে। তবে ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দুটি চড়িয়ে দোব কি?

—তাই দাও।

ঠাকুর চলে যাচ্ছিল। সুমিত্রা ডেকে বললে, আর শোন, ওর খাওয়া হয়ে গেলে, ও যেন চলে না যায়। এইখানেই বিশ্রাম করতে বলবে। ওকে দরকার হতে পারে।

কুণালদের সঙ্গে, বলতে গেলে, কথা কিছুই হয়নি। চুক্তির খসড়ায় কোথায় কী পরিবর্তন হল, ইম্প্রেসারিও কোন্ কোন্ সর্তে আপত্তি করেছিল, বিস্তৃতভাবে কোনো আলোচনাই হয়নি। বিকেলে ওরা নিশ্চয় আসবে। প্রয়োজন হলে, বাইরে বেরুনোর দরকার হতে পারে।

সুতরাং ড্রাইভারের থাকা দরকার।

রামধন আর টেলিফোন করেনি। বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে ঠাকুর নিজে গিয়েছিল। গাড়ি ছিল না বলে তাকে বাসে যেতে

হয়েছিল। সেও এসে কিছু যখন বলেনি তখন মনে হয় অপূর্ব ভালোই আছে।

তবু ঠাকুরকে একবার ডাকলে।

—বাবুর খাবার তুমি নিয়ে গিয়েছিলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বাবুর সঙ্গে দেখা হল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেমন আছেন বললেন ?

একটু ইতস্তত করে বললে, কিছু বললেন না। তবে শরীরটা ভালো ঠেকল না।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে সুমিত্রা বললে, ভালো ঠেকবে কি করে ? দিনরাত ভূতের চর্চা করলে শরীর ভালো থাকে কখনও ?

ঠাকুর ভয় পেয়ে গেল।

জড়িত কণ্ঠে বললে, আজ্ঞা ভূ—ত !

—হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখান ? ভূত নামাচ্ছেন আর কথা বলছেন !

ঠাকুর কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে।

তার দিকে চেয়ে সুমিত্রা বললে, তোমার মতো জ্যান্ত ভূত নয়, আস্ত মরা ভূত।

জিজ্ঞাসা করলে, ভাত চড়িয়েছ ?

ঠাকুরের গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছিল না। ঘাড় নেড়ে জানালে, চড়িয়েছে।

—তাহলে আর দাঁড়িয়ে থেক না। নিচে যাও।

—মা !

প্রচণ্ড চেষ্টায় শব্দটা ঠাকুরের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল।

—কি ?

—সাঁঝবেলায় আমি খাবার নিয়ে যেতে পারব না।

সুমিত্রার প্রচণ্ড হাসির বেগ এসেছিল। প্রাণপণে গাম্ভীর্য রক্ষা করে বললে, পারবে না কেন?

কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে ঠাকুর বললে, ভূতে আমার বড় ভয়। আমি মরে যাব।

—আচ্ছা, সে সাঁঝবেলা আসুক, তখন দেখা যাবে। এখন ড্রাইভারকে ছুটি খাইয়ে দাও।

সুমিত্রা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। হাসি চাপবার জন্যে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

পাঁচটার পরে কুণাল এল।

আরও কিছু পরে অমল। তারপরে একে একে কল-কাকলীর অন্য ছেলে-মেয়েরা। কারও চোখে ঘুম নেই। বম্বে মস্ত বড় শহর। এখান থেকে কত দূর! ধনীর শহর। এখান থেকে সেখানে যাবে নাচ দেখাতে। সহজ ব্যাপার তো নয়।

খবর বেরুবে ওখানকার কাগজে, এখানকার কাগজেও। বলতে গেলে ভারতবর্ষের সমস্ত কাগজেই তাদের নাম ছাপা হবে। একটা অসাধারণ কাণ্ড।

সকলের চোখে আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা।

কি হল? কি হল? শেষপর্যন্ত যাওয়ার কোনো বিঘ্ন হবে না তো?

কুণাল সকলকে আশ্বাস দিলে, কোনো বিঘ্ন হবে না। যাওয়া পাকাপাকি স্থির। চুক্তির সর্তে উভয় পক্ষই সম্মত। সবাই বাক্স-বিছানা বাঁধতে পার।

—ট্রেনে? না প্লেনে?

—ট্রেনে।

—ওখানে উঠব কোথায়?

—একটা প্রথম শ্রেণীর হোটেলে; কোনো দিক দিয়ে কোথাও খুঁৎ রাখিনি। এমনকি এ-ব্যবস্থাও হয়েছে, দুখানা গাড়ি সব সময় আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমরা যখন খুশি, যেখানে খুশি যেতে পারব।

আনন্দে সবাই করতালি দিয়ে উঠল।

এর চেয়ে সুব্যবস্থা আর কি হতে পারে? স্বর্গেও এর চেয়ে বেশি আরামের ব্যবস্থা নেই।

—চুক্তিপত্র সই হয়ে গেছে?

—সে একরকম হয়ে যাওয়াই। কাল চুক্তিপত্র টাইপ হবে, কালই সই হবে, কালই ইম্প্রেসারিও বম্বে চলে যাবে।

—যাওয়ার দিন কবে হল?

—বারোই বম্বে-মেলে এখান থেকে যাত্রা করব, চোদ্দই পৌঁছুব। পোনেরোই থেকে প্রত্যহ শো একুশ তারিখ পর্যন্ত। বাইশে ক্যালকাটা-মেলে ওখান থেকে রওনা হব।

—বাঃ! এ তো বড় মজা! যাব বম্বে-মেলে, ফিরব কলকাতা-মেলে?

—হ্যাঁ। ওইটেই চুক্তির বিশেষত্ব। ওরা বম্বে-মেলে ফিরতে দিতে কিছুতে রাজি হল না।

কুণাল বললে, বাসন্তী, তোমার ঘোরাঘুরি এই ক'টা দিন একটু স্থগিত রাখ। চেহারার জৌলুস নষ্ট হলে চলবে না। এই ক'টা দিন এটু ঘষামাজা এবং বিশ্রামের ওপর থাকতে হবে।

বাসন্তী সলজ্জভাবে মাথা নিচু করে সম্মতি জানালে।

সুমিত্রা অমলকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ তো?

—নিশ্চয়।

—তুমি হবে আমাদের প্রচার-সচিব। ওখানে তোমার বন্ধু-বান্ধব তো কিছু আছে?

—আছে কিছু। সেদিক দিয়ে অসুবিধা হবে না। কয়েকজনকে আমি আগেই খবর পাঠাব।

কুণাল বললে, সুমিত্রাদি, ভালো চাও তো ওকে সঙ্গে নিয়ো না।

—কেন ?

অমলের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে কুণাল বললে, ওকে তুমি চেন না। ওরকম ফাঁকিবাজ ভূ-ভারতে নেই। শুনেছে দুখানা গাড়ি থাকবে। একখানাতে ও চব্বিশঘণ্টা ঘুরে বেড়াবে শহর দেখতে। খাওয়ার সময় ছাড়া ওকে পাওয়াই যাবে না।

সবাই হেসে উঠল।

সুমিত্রা বললে, এর উত্তরে অমল, তোমার কি বলবার আছে ?

—কিছু না। সবাই জানে, ও আমায় হিংসা করে।

আর এক প্রস্থ হাসির রোল উঠল।

সুমিত্রা বললে, যাই বল, আমার কিন্তু ভয় করছে।

—কেন ?

—সেখানকার দর্শকদের চিনি না। কে জানে, আমাদের নাচ তাদের ভালো লাগবে কিনা।

অমল সগর্বে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, তবে আর আমি যাচ্ছি কি জন্যে ?

কুণাল বললে, কেন, তুমি গিয়ে কি করবে ?

চোখ পাকিয়ে অমল বললে, ভালো লাগিয়ে দোব।

—কি করে ?

—প্রচারের ভেল্‌কিতে।

সুমিত্রার দিকে চেয়ে অমল বললে, আমাদের দেশের দর্শকদের ভালো-মন্দর বোধ কম। প্রাচীরপত্রে, বিজ্ঞাপনে, খবরের কাগজে লিখিয়ে তাদের একেবারে কাৎ করে ফেলতে হবে, সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন কাল্‌মে অ্যায়সা কভি নেহি হুয়া। তারা দেখবে, হাসবে, কাঁদবে আর যাবার সময় বলতে বলতে যাবে, এ না

দেখলে মানব-জন্ম বৃথা হত। এর নাম প্রচার-কার্য! বুঝলে কুণাল, এ তোমার ব্যায়লার ছড় টানা নয়।

কুণাল বললে, খুব বাহাদুর! চলনা একবার বম্বে, রাস্তায় তোমাকে হারিয়ে দিয়ে চলে আসব।

অমল বললে, চালাকি করতে হবে না। বম্বে অমি চারবার গেছি। এই নিয়ে পাঁচবার হবে।

—মিথ্যে কথা। তুমি লিলুয়াও পার হওনি। বল তো দেখি কেমন দেখতে ব্যাণ্ডেল স্টেশন? কেমন দেখতে খড়গপুর?

অমল স্বীকার করলে, ও-তুটো ষ্টেশন সে দেখেনি।

—তাহলে বম্বে গেলে কি করে?

—স্বপ্নে। সুতরাং ব্যাণ্ডেলও পার হতে হয়নি, খড়গপুরও না। বুঝলে কুণাল, মিছে কথা আমি তোমার মতো বলি না। যাক্‌গে। ক্লাবে যাবে না?

সবাই উঠে দাঁড়াল।

সুমিত্রা বললে, তোমরা চল। আমি একটু বাদেই যাচ্ছি।

বম্বের ব্যাপারটা নিয়ে সমস্ত দিন সুমিত্রার গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেছে। দিনে একটি ফোঁটাও ঘুম হয়নি। শরীর এবং মন তুইই অবসাদগ্রস্ত। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। বম্বের ঝামেলাটা মিটেই গেছে বলা চলে, তবুও না।

ওদের বিদায় করে গুন্‌গুন্ করে গানের একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সুমিত্রা শোবার ঘরে গেল। এবং ঝুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করলে, নিদ্রা না হোক ,একটুখানি তন্দ্রাও যদি আসে। তাহলেও অবসাদটা কাটতে পারে।

কিন্তু বৃথা।

কেবলই নানা এলোমেলো চিন্তা আসে।

অপূর্ব। কি যে বাতিক তাকে পেয়ে বসল, একেবারে জীবনটাই নষ্ট করে দিলে। বিয়ের আগে কিম্বা পরে একদিনও অপূর্বর মুখে সে অপর্ণার নাম পর্যন্ত শোনেনি। হঠাৎ বহুদিন পরে তারই একটা পুরোনো ছবি নিয়ে মেতে উঠল! সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে ধ্যান-ধারণায় বসে গেল!

কে জানে কেন।

এই যে ফিটের অসুখ, কে জানে এরই-বা উৎস কোথায়। আজ একটু ভালো আছে। কিন্তু ভালো থাকলেও ডাক্তার দিয়ে শরীরটা দেখিয়ে নিতে ক্ষতি কি ছিল?

পাগল আর কাকে বলে!

আর এক পাগল ঠাকুরটা। ভূতের নাম শুনে কিরকম ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল! না পালায় তো ভালো। ওকে ভয় দেখানো ঠিক হয়নি।

সুমিত্রার হাসিও এল, দুশ্চিন্তাও হল। ঠাকুর পালিয়ে গেলে মহা মুশকিলের ব্যাপার।

তারপরে এই বম্বে।

চুক্তিপত্রের গোলমালটা মিটেছে বটে, কিন্তু এ নিয়েও তার দুশ্চিন্তা কম নয়। অপরিচিত দর্শক। কে জানে ওদের নাচ তাদের কেমন লাগবে!

যদি ভালো না লাগে, দর্শকের ভিড় যদি না হয়, সেও গভীর লজ্জার বিষয়।

কিন্তু সুমিত্রা আর ভাববে না। একটুখানি তন্দ্রা অন্তত তার বিশেষ দরকার। সে আবার চোখ বন্ধ করলে। কিচ্ছু ভাববে না। শুধু একটু ঘুম। তবু ঘুম আসে না।

তার বদলে আসে অনর্গল নানা চিন্তা।

কিছুক্ষণ মিথ্যে চেষ্টা করার পর সুমিত্রা হতাশভাবে উঠে বসল।

গা ধুয়ে ক্লাবেই যাওয়া যাক। সেখানে, আর কিছু না হোক, পাঁচটা হাসি-গল্পে মনটা ভালো হবে।

যা জুটেছে কুণাল আর অমল! ওদের দিন-রাত্রি ঝগড়া, দিন-রাত্রি ভাব।

সুমিত্রা বাথরুমে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢাললে। শরীর মন অনেকখানি ঠাণ্ডা হল। গুন্‌গুন্ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে প্রসাধনে মন দিলে।

সিঁথিতে সিন্দুরের রেখা দিচ্ছে এমন সময় রামধন পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল।

চমকে উঠল সুমিত্রা। সিঁথির সিন্দুর-রেখা বেঁকে গেল। চীৎকার করে উঠল, কি রে?

রামধন মেঝেয় গড়াগড়ি দেয় আর কাঁদে: এখনি আপনাকে যেতে হবে। মা গো! বাবুর অবস্থা ভাল নয়।

সুমিত্রা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। বললে, অমন করছিস কেন? কি হয়েছে বল্!

—তুমি চল, মা। বাবুর অবস্থা ভালো নয়। আমি গাড়ি এনেছি।

সুমিত্রা হাত ধরে তাকে তুললে। বললে, চল্।

ব'লে সেই অবস্থাতেই রামধনের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে বসল। শাড়িখানাও ভালো করে পরা হয়নি।

॥ একুশ ॥

তখন সন্ধ্যা হয়েছে।

গাড়িখানি ফটকের কাছে আসতেই দারোয়ান সেলাম করে ফটক খুলে দিলে।

নিঝুম বাড়ি।

আধখানায় চাঁদের আলো পড়েছে। আধখানা অন্ধকার। সামনের বাগানের গাছগুলো অন্ধকারে কি যেন আশঙ্কায় থরো-থরো কাঁপছে। ওপাশে অন্ধকারে একটা কিসের যেন ঝোপ ভালুকের মতো ধুঁকছে।

ওই দূরে, ওখানে কি কেউ দাঁড়িয়ে আছে? আপাদমস্তক ঘোমটা-দেওয়া কোনো মেয়ে? না ওটা চাঁদের আলো, কিসের উপর পড়ে অমনি দেখাচ্ছে?

হঠাৎ কি ঝড় এল? না, ওই মেয়েটা তার ফুটফুটে শাড়ির আঁচলের একটা ঝাপটা দিলে? গাছগুলো হঠাৎ অমন শব্দ করে দুলে উঠল কেন?

সুমিত্রার গা ছমছম করছে। বুক দুরু-দুরু কাঁপছে। গলা শুকিয়ে আসছে। গাড়ি থেকে নেমে রামধনের পিছু পিছু দ্রুতপদে উপরে উঠল।

বারান্দায় একটা আলো জ্বলছে। এখানে-ওখানে অনেক আলোই জ্বলছে। কিন্তু তার জোর নেই।

ফিসফিস করে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, আলোগুলো এত কম-জোর কেন রে?

চলতে চলতেই রামধন জবাব দিলে, বাবু জোর আলো পছন্দ করেন না। সব জায়গায় কম-জোর আলোর ব্যবস্থা।

রামধন যেন ছুটছে। বাধ্য হয়ে সুমিত্রাকেও তার পিছু পিছু ছুটতে হচ্ছে। হাঁফাচ্ছে সে।

বললে, একটু আস্তে চল্, বাবা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাবুর জন্যে ব্যস্তভাবে সে ছুটছিল। যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিল, এখন কেমন আছে কে জানে! সুমিত্রার কথা সে ভাবেইনি। তার কথায় লজ্জিতভাবে পা খাটো করলে।

ঘরের মধ্যে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। তার ঢাকাটা অপূর্বর চোখের দিকে আড়াল-করা।

ছোট একখানা খাটের উপর বিছানা। ধপধপে সাদা চাদর। তার উপর অপূর্ব নিস্পন্দ শুয়ে রয়েছে। তার কোমর পর্যন্ত চাদর ঢাকা।

পা টিপে টিপে ওরা দুজনে ঘরে ঢুকল।

আগে সুমিত্রা, পিছনে রামধন।

অপূর্ব চোখ বন্ধ করে শুয়ে। ওদের আসা টের পেলে বলে বোধ হল না। ঘুমুচ্ছে হয়তো।

সুমিত্রা আরো এগিয়ে এল। একেবারে খাটের কাছে।

রামধন দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল।

সুমিত্রা চেয়ে দেখল, শান্ত মুখ। চিরদিন যেমন দেখে এসেছে তেমনি শান্ত। তাতে যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু শ্রান্ত। রক্তহীন কাগজের মতো সাদা।

একবার ঠোঁটের কোণে যেন একটা হালকা হাসি খেলে গেল।

বোধহয় স্বপ্ন।

সুমিত্রার মন করুণায় গলে গেল।

আহা রে!

পা টিপে টিপে আবার বেরিয়ে এল। রামধনকে ডেকে নিয়ে এল ওদিকের গাড়ি-বারান্দায়। এতটা পথ দুজনে মোটরে এসেছে,

কিন্তু কেউ কথা কয়নি। কী ব্যাপার সুমিত্রাও জিজ্ঞাসা করেনি, রামধনও বলেনি। দুজনেই নিঃশব্দে শুধু ভেবেছে, চেয়েছে চক্ষের পলকে এখানে পৌঁছে যেতে।

এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করবার সময় হল : কি হয়েছিল রে রামধন? অত ভয় পেয়ে গিয়েছিলি কেন?

সুমিত্রা দেখে রামধনের ভয় অনেকটা কেটেছে। অপূর্বও অনেকটা ভালো। ঘুমুচ্ছে।

একটা চেয়ার টেনে এনে রামধন সুমিত্রাকে বললে, বলছি। আপনি বসুন।

রামধন বলতে লাগল :

সকালে আপনাকে তো ফোন কন্নু মা, তখন বাবু বেশ সহজ মানুষ। চা খেতে খেতে আমার সঙ্গে কত গল্প করলেন :

তোর দেশ কোথায় যেন, ভুলে যাচ্ছি।

বন্নু, দেশ আমার নেই, বাবু।

বাপ-মা?

নেই। এখন আপনারাই আমার বাপ-মা।

তাই বটে। তোকে কখনও ছুটি নিতে দেখিনি।

বন্নু, ছুটি নিয়ে আর কি করব বাবু, কোথায়-বা যাব? তাই নিই না।

বললেন, এখানে তোর কষ্ট হচ্ছেনা তো?

না বাবু।

ভয়?

না বাবু, ভয়েরই বা কি আছে? আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে —ফাঁকা থাকা, রাত-বিরিত, গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাপ এসবে ভয় করে না।

আর কিছু বললেন না। বেশ সহজ কথা। আমার খুব ভালো লাগল। আপনাকে টেলিফোনটা করে এনু।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে বিছানায় শুলেন। দু'তিন বার উঁকি দিয়ে দেখলাম, অঘোরে ঘুমুচ্ছেন।

বিকেলে যেমন ওঠেন, উঠলেন। চা এনে দিলাম। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে চায়ে একটা চুমুক দিলেন। তারপরে হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হলেন। চারিদিকে চকমক করে চাইতে লাগলেন। হাতের পেয়ালাটা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল। হঠাৎ চোখ স্থির হয়ে গেল। হাতের পেয়ালাটা ঝন্‌ঝন্‌ করে মেঝেয় পড়ে গেল। সে কী শব্দ মা!

বাবু অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

দারোয়ানকে চীৎকার করে ডাকতেই সে ফটক বন্ধ করে ছুটে এল।

তারপরে কী কাৎরানি! মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। লাল চোখে তারা-দুটো ভাঁটার মতো ঘুরছে। সে চোখে দেখা যায় না, মা।

দেড় ঘণ্টা অমনি কাটল। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে ধীরে ধীরে জ্ঞান হল। আমাদের দিকে চাইলেন।

জিগ্যেস কনু, বাবু, আমাকে চিনতে পারছেন?

খুব আস্তে বললেন, রামধন।

একটু গরম দুধ খাইয়ে শুইয়ে দিলাম।

ওমা! পোনেরো মিনিট পরে আবার। ঘণ্টাখানেক ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করে জ্ঞান যদি হল তো আধঘণ্টা পরে আবার!

বুঝলাম, এ আমাদের কাজ নয়। জ্ঞান করিয়েই ছুটলাম আপনার কাছে। এখন যা হয় করুন।

রামধন হাতজোড় করলে।

—ডাক্তার ডেকেছিলি?

—না মা, সময় পেনু কই ?

ডাক্তারের কাছে রামধন এখনই চলে যেতে পারে। ডাঃ ঘোষ সুমিত্রার শ্বশুর রায়বাহাদুরের বন্ধু। তাঁর কাছে গেলে নিশ্চয়ই তিনি আসবেন। সুমিত্রার সঙ্গেও পরিচয় আছে। সুমিত্রা তাঁকে কাকাবাবু বলে।

কিন্তু এত দূরে থেকে, না ফোন না কিছু, স্থায়ী চিকিৎসা কি সম্ভব ? অথচ অপূর্বকে এখন কি কলকাতার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া চলবে ? কে জানে তার হার্টের অবস্থা কেমন।

সুমিত্রা রামধনকে জিজ্ঞাসা করলে, ডাঃ ঘোষকে তো তুই চিনিস। শ্বশুরমশায়ের বন্ধু। তাঁর অসুখের সময় রোজ আসতেন। তার পরেও কতবার এসেছেন। ফরসা রং, লম্বা, ছিপছিপে।

রামধন এতক্ষণে চিনতে পারলে : ও হো, শ্যামবাজারে থাকেন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুই গাড়ি নিয়ে এক্ষুনি চলে যা। হাতে-পায়ে ধরে, যেমন করে হোক, এখুনি নিয়ে আসবি। আমি এখানেই রইলাম।

সুমিত্রার চিঠি নিয়ে রামধন তখনই বেরিয়ে পড়ল। সুমিত্রা অপূর্বর খাটের পাশে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

অন্ধকার প্রেতপুরী। চারিদিকে জমাট স্পর্শগ্রাহ্য নিস্তব্ধতা। দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলামটা যেন সেই স্তব্ধতার পরিমাপের চেষ্টা করছে।

কিন্তু সে-কথা সুমিত্রার মনেই হল না। অপূর্ব অকাতরে ঘুমুচ্ছে। সুমিত্রা তার শান্ত, শ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে বসে রইল।

ডাঃ ঘোষ বাড়িতেই ছিলেন। অপূর্বকে তিনি ছেলের মতোই স্নেহ করেন। উভয় পরিবারে দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব। সুমিত্রার চিঠি পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন।

গাড়ি ফেরার শব্দ পেয়ে সুমিত্রা সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ল।

ডাঃ ঘোষ উপরে আসতে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সুমিত্রা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

এই প্রথম সে কাঁদলে। তাকে কাঁদতে দেখে রামধন অবাক।

সস্নেহে তার মাথায় হাত দিয়ে ডাক্তার ঘোষ আশ্বাস দিলেন, ভয় কি মা! ভয়ের কি আছে? চল আমি দেখছি। কোন ঘরে আছে?

অপূর্বর ঘুম ভেঙে গেছে। আলস্যভরে চোখ বুঁজে পড়েছিল। ডাক্তারবাবুর পায়ের শব্দে চোখ মেলে চাইলে।

—কাকাবাবু?

—হ্যাঁ, বাবা। এখন কেমন আছ?

—ভালো।

ডাঃ ঘোষ কিছুক্ষণ ওর চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখ স্বাভাবিক বোধ হল না। তারপর স্টেথোস্কোপটা বের করে বুক-পিঠ পরীক্ষা করলেন। নাড়ি দেখলেন, জিভ। শেষে রক্তচাপ-পরীক্ষার যন্ত্রটা বের করলেন।

অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কতদিন?

—বছরখানেক হবে।

—ও-বাড়ি?

ওটাও আছে।

ডাঃ ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, একে ও-বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। বেশ কিছুদিন চিকিৎসার দরকার। সেটা এখানে থেকে সম্ভব নয়।

—আজকেই?

—অসুবিধা থাকলে কাল সকালে নিয়ে যেতে পার।

সুমিত্রা বললে, কিন্তু এখন হলে ক্ষতি কি, আপনি সঙ্গে রয়েছেন। সাহস পেতাম।

—বেশ তো। তাই চল।

সুমিত্রা নিজে বলতে সাহস পেলে না বোধ হয়। ডাঃ ঘোষকে বললে, তাহলে ওঁকে বলুন সে-কথা।

ডাঃ ঘোষ ডাকলেন, অপূর্ব!

অপূর্ব নিঃশব্দে চোখ মেলে চাইলে।

—কেমন বোধ করছ?

—ভালো।

—ও-বাড়িতে যেতে পারবে?

অপূর্ব কথাটা ঠিক বুঝলে কিনা বোঝা গেল না। বললে, পারব।

—নিচে নামতে পারবে?

—পারব।

—ওঠ তাহলে।

অপূর্ব উঠে বসল। খাট থেকে নেমে ধীরে ধীরে নিচে নামল। ঠিক ঘুমন্ত মানুষ যেমন করে হেঁটে চলে, তেমনি করে।

তার একপাশে ডাঃ ঘোষ, অন্যপাশে সুমিত্রা। পিছনে দারোয়ান, সামনে রামধন।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিলে। ভ্রূক্ষেপহীন পদে গট গট করে অপূর্ব গাড়িতে গিয়ে বসল।

তার একপাশে সুমিত্রা, অন্যপাশে ডাঃ ঘোষ।

রামধন জিজ্ঞাসা করলে, সেও সঙ্গে যাবে তো? না এখানে থাকবে?

সুমিত্রা বললে, যাবি বই কি।

—তাহলে একটু দাঁড়ান, ঘরগুলো তালা-বন্ধ করে আসি।

রামধন ছুটে উপরে চলে গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে একগোছা চাবি হাতে নিয়ে ফিরল।

দারোয়ানকে নির্দেশ দিলে সাবধানে থাকতে। কাল সকালে এসে সে সব ব্যবস্থা করবে।

ড্রাইভারকে বললে, চলুন।

ডাঃ ঘোষ ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে বলে দিলেন, যেন ঝাঁকুনি না লাগে। অপূর্বর ডান হাতের মণিবন্ধ নিজের হাতে নিলেন, বোধ হয় নাড়ির গতি দেখবার জন্যে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওরা এ-বাড়ি পৌছে গেল। সমস্ত পথ অপূর্ব একটা সাড়া দিলে না। ওঁরাও নিঃশব্দেই এলেন।

॥ বাইশ ॥

নিচের ঘরে তখন পুরোদমে গুলতানি চলছে।

সন্ধ্যা হয়ে যেতেও যখন সুমিত্রা এল না, ওরা চিন্তিত হল : সুমিত্রা এল না কেন? কি হল তার? ওরা সদলবলে সুমিত্রার বাড়ি এল।

এসে শুনলে, বাবুর অসুখ, সুমিত্রা বাগান-বাড়ি গেছে।

সে আবার কি!

ক'দিন পরে বম্বে যাওয়া। কাল চুক্তিপত্রে সই হবে। এখন বাবুর অসুখ হলে চলবে কেন?

—কখন ফিরবেন?

—জানি না।

হাতে কারোই কোনো কাজ নেই। এই সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরেই বা করবে কি? একটু অপেক্ষাই করা যাক্ বরং। রাত্রি ন'টার মধ্যে ফেরে তো ভালো, নইলে চলে যাবে।

উপরের হলঘরে আর গেল না। সুমিত্রা নেই। নিচের হলঘরেই অপেক্ষা করতে লাগল।

আড্ডা বেশ জমে এসেছে যখন, ন'টা বাজতে দেরি নেই, সেই সময়ে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।

প্রথমে নামল সুমিত্রা।

ওরা কলরবের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করতে যাবে এমন সময়ে সামনের সীট থেকে লাফ দিয়ে নেমে রামধন সন্তর্পণে অপূর্বকে নামাতে এল।

কিন্তু তার দরকার হল না। অপূর্ব নিজেই নামল এবং সুমিত্রার পিছু পিছু হলঘরে ঢুকল। তার পিছনে পক্ককেশ ডাঃ ঘোষ স্বয়ং। তাঁর পিছনে রামধন।

কল-কাকলীর সকলেই উঠে দাঁড়াল। কি ব্যাপার!

সুমিত্রা ওদের দিকে চাইলেই না। ভিতরে চলে গেল। সর্ব্বশেষে রামধনও যখন ভিতরদিকের পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল তখন ওরা নিঃশব্দে স্তম্ভিতভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন করতে লাগল।

কি ব্যাপার?

কাকেও তো অসুস্থ মনে হল না। অপূর্ব তো দিব্য গট গট করে হেঁটে উপরে চলে গেল।

তবে?

ঠাকুরকে চায়ের ফরমাইস দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিন সুমিত্রা দেয়, আজ গৃহকর্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সে-ভারটা তারা নিজেরাই নিয়েছিল।

কিন্তু ঠাকুর কি চা নিয়ে আসবে?

আসবার সময় পাবে এখন?

ঘরের মধ্যে থেকে দেখা কিছু যাচ্ছে না বটে, কিন্তু একটা নিঃশব্দ ব্যস্ততার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। উপর থেকে নিচে এবং নিচে থেকে উপরে অনেক লোকের দ্রুত অথচ শব্দহীন পদসঞ্চার।

অমল কুণালের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে।

কুণাল সকলের দিকে।

দেখা গেল রামধন কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এই ঘরের ভিতর দিয়ে বাইরে চলে গেল। বোধ হয় ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ আনবার জন্যে।

ওরা চোখে-চোখে ইসারা করলে, চল, ওঠা যাক।

হ্যাঁ।

সকলে উঠে দাঁড়াল এবং নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

ডাঃ ঘোষ বললেন, অপূর্বর ফিটের অসুখ ছিল বলে তো শুনিনি। আর কখনও কি হয়েছে?

সুমিত্রা বললে, আমি তো কখনও দেখিনি।

ঠাকুর বললে, আমার কুড়িবছর এখানে চাকরী হল বাবু, আমিও কখনও দেখিনি।

ডাঃ ঘোষ চিন্তা করতে লাগলেন: নানা কারণে এরকম হওয়া সম্ভব।

সুমিত্রা অপূর্বর ধ্যান-ধারণার বিস্তৃত বিররণ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এর জন্যে কি হতে পারে?

—অসম্ভব নয়! কিসের জন্যে কী হয় বলা শক্ত। আজ একটা ইনজেকশন দিয়ে যাচ্ছি। বিশেষ কিছু নয়, হার্টটাকে একটু চাঙ্গা করবার জন্যে। কাল সকালেই ফের আসব।

ইতিমধ্যেই রামধন ইনজেকশন নিয়ে ফিরল।

ডাঃ ঘোষ ইনজেকশন দিলেন। অপূর্ব আপত্তি করলে না। এমনকি বিস্মিন হল না। নিঃশব্দে হাতটা বাড়িয়ে ইনজেকশন নিলে। একবার চোখটা খুললে মাত্র, তারপরেই আবার বন্ধ করলে।

ডাঃ ঘোষ চলে যাবার সময় সুমিত্রা আবার তাঁর পায়ের ধূলো নিলে।

জিজ্ঞাসা করলে, সকালে কি গাড়ি পাঠাবার দরকার হবে কাকাবাবু?

—কিচ্ছু দরকার হবে না, মা। আমি নিজেই আসতে পারি। এ তো আমার চেনা বাড়ি।

ভদ্রলোক হা হা করে হাসলেন।

সুমিত্রা রললে, বাবা নেই। এখন আপনিই আমাদের অভিভাবক।

—তাই তো বটে। তোমার শ্বশুরের সঙ্গে আমার সেই সম্পর্কই ছিল। কোনো চিন্তা কোর না, মা। যা করবার আমি করব।

কেবল একটি কথা বলে যাই: অপূর্বকে কেউ বিরক্ত করবে না। ওকে সমস্তরকম উত্তেজনা থেকে দূরে রাখতে হবে। উত্তেজনা ওর পক্ষে খারাপ। আর সকল সময় ওর কাছাকাছি যেন লোক থাকে।

—তাই হবে।

ডাঃ ঘোষ চলে যেতে সুমিত্রা রামধনকে বললে, এইখানে মেঝেয় আমার বিছানা করে দে। দিয়ে, খেয়ে আয়। তুই এই বারান্দায় শুবি।

—আপনি খাবেন না মা?

—না মোটে ক্ষিদে নেই।

ক্ষুধা রামধনেরও নেই। যা দেখেছে তাতে তার পেটের ভিতরটা অসাড় হয়ে গেছে। সুমিত্রাকে খাবার জন্যে সে জেদ করলে না। নিজেও না খেয়ে, একবার নিচে থেকে ঘুরে চলে এল। তারপর বিছানা পেতে চুপ করে বসে রইল।

সুমিত্রা চুপ করে শুল বটে, কিন্তু তারও চোখে ঘুম নেই। একবার করে উঠে বসে, আর ছাখে অপূর্ব ঘুমুচ্ছে কিনা।

অপূর্ব অকাতরে ঘুমুচ্ছে কিনা।

রামধনেরও সেই অবস্থা। একবার শুচ্ছে, একবার বসছে, একবার উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছে বাবু কি করছেন।

এই অবস্থায় একবার সুমিত্রার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল।

সুমিত্রা বাইরে এল।

—তোর ঘুম আসছে না, না রে?

—না, মা।

কিন্তু দুজনে জেগে থেকে কি হবে? একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর্। আমি তো জেগেই আছি।

রামধন প্রতিবাদ করলে না। নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম কারও এল না।

সকালেই ডাঃ ঘোষ এলেন।

সুমিত্রা তখন স্নান সেরে এসেছে। কিন্তু অপূর্বর ঘুম তখনও ভাঙেনি।

ডাঃ ঘোষ বললেন, ওকে বিরক্ত করে কাজ নেই, মা। চল আমরা বাইরে একটু বসিগে।

জিজ্ঞাসা করলেন, এই-যে ধ্যান-ধারণার কথা বলছ, মা, এ কতদিন আরম্ভ হয়েছে?

—এক বছরের উপর।

—কি করে?

—দিদির ছবির সামনে বসে ধ্যান করেন। বলেন, দিদি আছেন, তিনি আসেন, তাঁর সঙ্গে কথা হয়। এ কি সত্যি হতে পারে কাকাবাবু?

ডাঃ ঘোষ হেসে বললেন, কি করে বলব মা? পৃথিবীতে কী সত্যি আর কী মিথ্যে কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। ওর আচরণে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখেছ?

—তেমন কিছু নয়। শুধু নিরিবিলি থাকতে ভালোবাসতেন। গোলমাল সহ্য করতে পারতেন না। সেইজন্যে বাগান-বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন।

ডাঃ ঘোষ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কথাবার্তার কোনো অসংলগ্নতা লক্ষ্য করেছ?

—না।

ঠাকুর এসে জানালে, নিচে সেই দুজন বাবু অপেক্ষা করছেন।

কুণাল এবং অমলের নাম ঠাকুর জানে না। বলতেও পারলে না। কিন্তু তাতে সুমিত্রার কোনো অসুবিধা হল না।

বললে, ওঁদের এখন যেতে বল।

ঠাকুর চলে গেল।

আগের কথার জের টেনে ডাঃ ঘোষ বললেন, তাহলে কি করে বলবে ওইজন্যে এই রোগটা।

সুমিত্রা বললে, আমি আমার সন্দেহের কথাটা শুধু জানালাম।

—সন্দেহ! সন্দেহ কিন্তু প্রমাণ নয়। তবে বলতে পার, সন্দেহের সূত্র ধরে অনেক সময় প্রমাণে পৌঁছান যায়।

ডাঃ ঘোষ ভাবতে লাগলেন।

একবার উঁকি দিয়ে দেখলেন, তখনও অপূর্ব ঘুমুচ্ছে।

সুমিত্রা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, এখনও ঘুমুচ্ছে?

ডাঃ ঘোষ হেসে বললেন, আমার সন্দেহ হচ্ছে, রাত্রে ও ঘুমোয়নি। এ ভোরের ঘুম। ভাঙতে একটু দেরি হতে পারে। শোন, আমি এখন যাই। এখন দেখে কোনো লাভ নেই। ওকে বিরক্ত করাও ঠিক হবে না। আমি আবার পাঁচটা নাগাদ আসব। সঙ্গে বোধ হয় একটি বন্ধুকেও নিয়ে আসব। তিনি এই রোগে বিশেষজ্ঞ।

ডাঃ ঘোষ চলে গেলেন।

সন্তর্পণে সুমিত্রা ঘরে এল। কিছুক্ষণ অপূর্বর মুখের দিকে চেয়ে থেকে চলে যাবে এমন সময় অপূর্ব চোখ মেললেঃ তুমি!

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য!

অপূর্ব ঘরের চারিদিকে কী যেন খুঁজলে। বোধ হয় অপর্ণার সেই ছবি। সেটা বাগান-বাড়িতেই ফেলে রেখে এসেছে।

—জানো সুমিত্রা, আমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিলাম। স্বপ্নই হবে, কি সত্যি তাও জানি না। অপর্ণা এসে আমার কাছে দাঁড়াল।

অপূর্ব আবার একবার ছবিটা খুঁজলে।

বললে, পরনে তার আসমানী রঙের শাড়ি। মাথায় মেঘের মতো কালো এলো-চুলে হীরের মতো অজস্র তারা ছিটোনো। মুখে তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদের মতো একফালি হাসি। চেয়ে আছি, কথা বলতে যাব, দেখলাম ধীরে ধীরে অপর্ণা যেন মিলিয়ে গেল তোমার মধ্যে। চোখ মেলে দেখি অপর্ণা নয়, তুমিই দাঁড়িয়ে রয়েছ। আশ্চর্য!

অপূর্ব ডান হাতখানি সুমিত্রার দিকে বাড়িয়ে দিলে। সুমিত্রা সেটি নিজের দুই হাতের মধ্যে নিলে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

শান্তকণ্ঠে বললে, বলা যায় না, এখন থেকে হয়তো আমার মধ্যেই তাকে তুমি পাবে।

—তাই হবে।

অপূর্ব আবার অলসভাবে চোখ বন্ধ করলে।

স্নানাহার করে সমস্ত দুপুর অপূর্ব অঘোরে ঘুমুলে।

পা টিপে টিপে ক'বারই এসে সুমিত্রা ফিরে গেল।

সকালে অপূর্বর উঠতে দেরি দেখে ডাঃ ঘোষ সন্দেহ করেছিলেন, অপূর্ব রাত্রে ভালো ঘুমোয়নি। সম্ভবত ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল। সুমিত্রার মনে হল, এও তাই নয় তো? এগারোটা থেকে কোন মানুষ এক নাগাড়ে চারটে অবধি ঘুমুতে পারে?

সুমিত্রা নিঃশব্দে অপূর্বর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। না, নিশ্বাসে তাল ভঙ্গ হচ্ছে না। চোখ একবারও পিট পিট করছে না। ঠায় একভাবে শুয়ে।

সে বেরিয়ে আসতে রামধন ফিস ফিস করে বললে, বাবুর এরকম ঘুম কোনদিন দেখিনি।

—দেখিসনি ?

—না। বরং দেখতাম ঘুম নেই। সমস্ত দুপুর ছবিটার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। রাত্রে, প্রায় সারা রাত, কখনও ছবির সামনে দাঁড়িয়ে, কখনও বা পায়চারি করতেন বারান্দায়। পরশু পর্যন্ত তাই করেছেন।

একটু চিন্তা করে সুমিত্রা বললে, কাকাবাবু বলছিলেন, উনি আসলে জেগেই থাকেন।

—না মা। জেগে থাকলে উনি শুয়ে থাকতে পারেন না, আমি বরাবর দেখে আসছি।

—কিন্তু এত ঘুম মানুষ ঘুমুতে পারে ? কাল রাত থেকে আজ অত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছেন। তারপরে আবার এগারটা থেকে এই চারটা পর্যন্ত।

রামধন চিন্তিতভাবে বললে, কি জানি মা।

চায়ের সময় হয়েছে। কিন্তু ডাঃ ঘোষ বলে গেছেন অপূর্বকে বিরক্ত না করতে।

সুমিত্রা অপেক্ষা করতে লাগল বাইরে একটা চেয়ারে।

একটু পরে বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে ঘরের ভিতরের দিকে চেয়ে হঠাৎ রামধন থমকে দাঁড়াল। ইসারায় জানালে, বাবু উঠেছেন।

সুমিত্রা ভিতরে গিয়ে দেখে, বিছানায় উঠে বসে অপূর্ব চকমক করে চারিদিকে চেয়ে কি যেন খুঁজছে। কি খুঁজছে সুমিত্রা জানে। কিন্তু সে প্রসঙ্গেই সে গেল না।

হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলে, ঘুম ভাঙল ?

ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে চেয়ে অপূর্ব গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আমি ঘুমুইনি তো ?

তেমনি পরিহাসস্নিগ্ধ কণ্ঠে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, তবে চোখ বন্ধ করে কি করছিলে?

উত্তরে অপূর্ব শুধু বললে, ঘুমোইনি।

এবং তেমনি অন্যমনস্কভাবে চারিদিকে চেয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল।

—তোমার চা নিয়ে আসি?

—আন।

—মুখটা ধোবে না?

—ধোব।

অপূর্ব বিছানা থেকে নামল। বাথরুমের দিকে চলল।

বাইরে টেবিলে রামধন চায়ের সরঞ্জাম সাজাচ্ছে। অপূর্ব এসে একখানা চেয়ারে বসল।

সুমিত্রা চা তৈরি করতে লাগল। রামধন খাবারের প্লেটটা এগিয়ে দিলে। সুমিত্রা এক পেয়ালা চা অপূর্বকে দিয়ে নিজে এক-পেয়ালা নিয়ে সামনের চেয়ারে বসল।

জিজ্ঞাসা করলে, এখন শরীর কেমন বোধ হচ্ছে।

—ভালো।

—কোনো গ্লানি নেই?

—না।

অপূর্ব সুমিত্রার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। কী রকম সে দৃষ্টি? রামধনের সামনে সুমিত্রা কেমন লজ্জা পাচ্ছিল।

বললে, রামধন, বাবুর বিছানাটা এই সময় ঝেড়ে রাখ।

রামধন চলে যেতে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি রাত্রে কি খাও?

—রামধন যা দেয়।

ফিক করে অপূর্ব একটু হাসলে। হাসিটা সুমিত্রার বেশ সুস্থ মনে হল। সে নিজেও হাসলে। বোধ করি চোখে একটা বিলোল কটাক্ষও হানলে।

বললে, এখানে রামধন নয়, আমি কর্ত্রী।

—তাহলে তুমি যা দেবে।

অপূর্ব আবার তেমনি স্থির দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে চেয়ে রইল। সুমিত্রাও ওর দিকে। মনে হল কথাটা আর কিছুই নয়, পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকার একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

সুমিত্রা বললে, বেশ, এখনি কাকাবাবু আসবেন। তিনি যা ব্যবস্থা করবেন তাই হবে।

বিস্মিত ভাবে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করলেন, কাকাবাবু কেন আসবেন?

—তোমাকে দেখতে।

—কেন, আমার কি হয়েছে?

—বিশেষ কিছুই হয়নি বোধ হয়। কিন্তু নানা অনিয়মে শরীরটাকে ভেঙে ফেলেছ। তার চিকিৎসা দরকার।

একটু চিন্তা করে অপূর্ব বললে, মাঝে মাঝে একটু দুর্বল বোধ করি। তাছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হয় না।

—দুর্বল বোধ করাটাই তো যথেষ্ট। তারজন্য চিকিৎসা দরকার।

অপূর্ব কিছু বললে না। চুপ করে রইল।

সুমিত্রা বললে, খাবার কিছুই তো ছুঁলে না।

—না। ভালো লাগছে না।

—অন্য কিছু খাবে?

—না। খেতে ভালো লাগে না। ইচ্ছেই করে না।

—ওই করেই তো শরীরটাকে মাটি করেছ। খেতে হবে খাওয়া ছেড়ে দিলে তো শরীর টেঁকবে না।

অপূর্ব চুপ করে রইল।

এমন সময় ডাঃ ঘোষ এলেন। সঙ্গে তাঁর সেই বন্ধু ডাক্তার।

ওঁদের দেখে দুজনেই উঠে দাঁড়াল।

—কেমন আছ ?—ডাঃ ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন।

—ভালো।

দু'টি ডাক্তারই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অপূর্বর দিকে চেয়ে। অপূর্ব যে তার জন্য খুব অস্বস্তি বোধ করছিল তা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু সে কিছু বললে না।

ডাঃ ঘোষ বললেন, একবার ঘরের মধ্যে যেতে হবে যে বাবা। ইনি একবার তোমাকে পরীক্ষা করবেন।

অপূর্ব অপাঙ্গে একবার সেই অপরিচিত ডাক্তারের দিকে চাইলে। মুখে বিরক্তির চিহ্ন একটু ফুটল! কিন্তু ডাঃ ঘোষ পিতৃবন্ধু। সুতরাং নীরবে ঘরে গিয়ে খাটে শুয়ে পড়ল।

দুজনে মিলে অপূর্বকে পরীক্ষা করলেন।

অনেকক্ষণ।

বুক, পিঠ, চোখ, জিভ—কিছুই বাদ রাখলেন না।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারটি অজস্র প্রশ্ন করলেন রোগের ইতিহাস জানবার জন্যে।

দু'পুরুষের ইতিহাস।

তার অনেক প্রশ্নের অপূর্ব জাবব দিতে পারলে না। সুমিত্রাও না। এ বাড়ির দীর্ঘকালের বন্ধু ও গৃহ-চিকিৎসক হিসাবে ডাঃ ঘোষ হয় তো তার কিছু কিছু বলতে পারলেন।

হতাশ ভাবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডাঃ ঘোষের দিকে চাইলেন।

বাইরে এসে বললেন, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।

ডাঃ ঘোষ সায় দিলেন ঃ না।

বিশেষজ্ঞটি ডাঃ ঘোষের ছাত্র। বললেন, সবই তো বেশ স্বাভাবিক।

ডাঃ ঘোষ বললেন, আজ সকালেও চোখের দৃষ্টি বেশ স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু এ বেলায় সেটাও কেটে গেছে।

বিশেষজ্ঞটি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, আমি বলি স্যার, ওঁকে কিছুদিন আপনার 'অবজারভেশনে' রাখুন। তারপরে দেখা যাবে।

ডাঃ ঘোষ একটা নিশ্বাস ছাড়লেন।

ম্লান হেসে বললেন, বুড়ো মানুষের ওপর ভার দিলে? বেশ তাই হবে।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারটি চলে গেলেন।

ডাঃ ঘোষ আর সুমিত্রা পাশের ঘরে গিয়ে বসলেন।

একটু পরে ডাঃ ঘোষ বললেন, আমি তোমার বাপের মতো বৌমা। আমাকে লজ্জা কোর না। যা জিজ্ঞেস করব, বলবে?

সুমিত্রার মুখ শুকিয়ে গেল। অজানিত আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করতে লাগল।

মুখ নামিয়ে বললে, বলুন।

—তুমি যে বলেছিলে, বড় বৌমার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অপূর্ব ধ্যান করে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে, সেটা কি ব্যাপার জান?

—না।

—আকস্মাৎ কেন অমন আরম্ভ করলে?

—কি জানি।

কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর আনত মুখের দিকে চেয়ে থেকে ডাঃ ঘোষ বললেন, কিছু মনে কোর না মা, তোমার সঙ্গে কি কোনো কলহ হয়েছিল?

—না।

—তুমি কি ওর প্রতি অমনোযোগী হয়েছিলে?

সুমিত্রা জবাব দিতে পারলে না। চুপ করে রইল।

ডাঃ ঘোষ বুঝলেন। বললেন, ভালো করনি মা। অপূর্বকে ছেলে-

বেলা থেকে জানি। বরাবরই ও খুব শান্ত, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভীষণ জেদী আর অভিমানী। তোমার কাছ থেকে যথেষ্ট মনোযোগ না পেয়ে ওর মন ঘুরে যায় বড় বৌমার দিকে, এই আমার সন্দেহ।

সুমিত্রা নতশিরে চুপ করে রইল।

ডাঃ ঘোষ বুঝলেন, মনে মনে সুমিত্রা অভিযোগ স্বীকারই করলে।

বললেন, ওর ব্যাধিটা যে ঠিক কি, তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ব্যাধি যাই হোক, তা সারাবার জন্যে ডাক্তারের চেয়ে আমি তোমার ওপরই ভরসা বেশি করি।

সুমিত্রা চমকে মুখ তুলে চাইলে: আমার ওপর কেন?

ডাঃ ঘোষ এতক্ষণ হেসে হেসেই কথা বলছিলেন। এবারে গম্ভীর হলেন। বললেন, তোমার ওপরই মা। তোমার জিনিস। পৃথিবীতে তুমিই ওকে সারাতে পার। আর কেউ নয়।

সুমিত্রা বললে; মেয়েদের ও যে স্বতন্ত্র ইচ্ছে থাকতে পারে, এ কি আপনি বিশ্বাস করেন না?

এবারে বৃদ্ধ হেসে ফেললেন।

বললেন, স্বতন্ত্র ইচ্ছা সকলেরই থাকতে পারে মা। নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সকলেরই। কিন্তু এক সঙ্গে থাকতে গেলে তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার।

নিঃশব্দে নতমুখে সুমিত্রা শুনে যেতে লাগল।

ডাঃ ঘোষ বলে চললেন: সেই সামঞ্জস্য আসে কোথা থেকে? ভালোবাসা থেকে? আবার এই ভালোবাসারই এক পিঠে জেদ, অন্য পিঠে আত্মসমর্পন। কখন কোনটা সামনের দিকে থাকে, কেউ বলতে পারে না। সে একটা আশ্চর্য ব্যপার।

ডাঃ ঘোষ থামলেন। অতীতের দিকে চেয়ে কি যেন দেখলেন। বললেন, আমার দুঃখের ইতিহাস তো তুমি জান মা।

সুমিত্রা বিস্মিত চোখে চাইলে: না তো।

—তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে শোননি কোন দিন ?

—না তো।

ডাঃ ঘোষ দূরে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

বললেন, আমার মেয়ের কথা। শোননি ?

সুমিত্রা নীরবে ঘাড় নাড়লে।

ডাঃ ঘোষ বলতে লাগলেন ঃ

জান তো আমার ওই একটি মাত্রই মেয়ে। বড় আদরের। সে বি, এ, পাস করার পর তার বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। অনেক চেষ্টার পর একটি ভালো ছেলে পাওয়া গেল। ছেলেটি বিলেত থেকে ডাক্তারী ডিগ্রী নিয়ে ফিরেছে। সব ঠিকঠাক। মেয়ে দেখতে আসবে, এমন সময় মেয়ে বেঁকে বসল ঃ সে বিয়ে করবে না।

এ আবার কি ! আমরা তো মাথায় হাত দিয়ে বসলাম।

আমি ভীষণ রেগে গেলাম। বিয়ে করবে না কি ! কাল তাঁরা মেয়ে দেখতে আসবেন, এখন বিয়ে করবে না বললেই হল !

এই অবাধ্যতা চলবে না। বিয়ে ওকে করতেই হবে এবং ওদের পছন্দ হলে ওই ছেলের সঙ্গেই।

ডাঃ ঘোষ থামলেন।

সুমিত্রা রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনে যাচ্ছিল। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলে, তারপর ?

—তারপরে আর কি !—হাত উলটে ডাঃ ঘোষ বললেন,—একদিন সকালে তাকে আর পাওয়া গেল না।

সুমিত্রা লাফিয়ে উঠল ঃ সে কি ! কোথায় গেল ?

ম্লান হাস্যে ডাঃ ঘোষ বললেন, দিন পোনেরোর মধ্যে সেটা জানতে পারলাম অনিলার চিঠিতে। লিখেছে, কানপুরে তারা পরম সুখে দাম্পত্য-জীবন যাপন করছে। আমাদের আশীর্বাদ চায়।

—আপনি আশীর্বাদ করেছিলেন?

—না। করা উচিত ছিল, কিন্তু পারিনি। ওই যে বললাম ভালোবাসার এক পিঠে আত্মসমর্পণ, অন্য পিঠে জেদ। সেই জেদ আমাকে তখন পেয়ে বসেছিল।

—তারপরে?

—তারপরে এই রকম বিবাহে প্রায়ই যা ঘটে থাকে তাই হল, অশেষ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে, এবং হয়তো অনুতাপের মধ্যেও, একদিন তার জীবনের প্রদীপ নিভে গেল।

—অনুতাপের মধ্যে কেন?

ডাঃ ঘোষের জবাব দেবার ইচ্ছা হচ্ছিল না। অনিচ্ছার সঙ্গেই বললেন, শুধু ভালোবাসার সলতেতেই তো প্রদীপ জ্বলে না মা, তেলেরও দরকার হয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, তাঁর শেষ মুহূর্তেও কি আপনি যাননি?

—গিয়েছিলাম মা। কিন্তু যখন খবর পেয়ে গেলাম, তখন যাওয়া না-যাওয়া একই কথা।

—ছেলেপুলে রেখে যায়নি?

না মা। কোনো চিহ্নই রেখে যায়নি। তাই বলছিলাম, ভালো-বাসার ক্ষেত্রে জেদ হল ঝড়। সতর্ক না হলে প্রদীপ নিভে যাবার আশঙ্কা থাকে।

সুমিত্রা হাসলে। বললে, আমি বলি আত্মসমর্পনও বন্যা।

ডাঃ ঘোষ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বুঝলেন মেয়েটি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী।

স্বীকার করলেন, মিথ্যে বলনি মা। বেশি কিছুই ভালো নয়। জেদও নয়, আত্মসমর্পনও নয়।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বললে, আমিও তাই মনে করি কাকাবাবু। যা স্বাভাবিক, তাই ভালো।

অপূর্বর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবার নির্দেশ দিয়ে ডাঃ ঘোষ উঠলেন। আর সুমিত্রা তাঁর মেয়েটির কথা ভাবতে লাগল।

সুমিত্রা ভাবছিল। ডাঃ ঘোষের মেয়ের কথা। তারপর কখন তার সঙ্গে বোধ হয় তার নিজের কথাও জড়িয়ে গেল। তার নিজের কথার সঙ্গে ডাঃ ঘোষের মেয়ের কথার মিল নেই। কিন্তু সুরের দিকে একটু বোধ হয় আছে। সেই সুরের ধারা বেয়ে সে বোধ হয় নিজের কথায় এসে পৌঁছে গেল। পৌঁছে গেল তো একেবারে তন্ময় হয়ে গেল।

এ-বাড়িতে প্রথম যেদিন এল সেদিন অপর্ণা ছিল না। ঘরের দেয়ালে অথবা বাড়ির কোথাও তার চিহ্ন ছিল না। ছিল না বলেই এ বাড়িতে তার আসা সম্ভব হয়েছিল।

অপর্ণার প্রশ্ন তার মনে সেদিন ওঠেইনি। অপূর্ব যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে সম্মত হয়েছে এই আনন্দেই শ্বশুর-শ্বাশুড়ী বিভোর হয়েছিলেন। পরেও কোনো প্রসঙ্গে অপর্ণার উল্লেখ করেননি। কোনো ছুতায় উভয়ের মধ্যে তুলনাও করেননি। অপূর্বও কোনোদিন অপর্ণার সম্বন্ধে আলোচনা করেনি। সুতরাং অপর্ণার প্রশ্ন সুমিত্রার মনে ওঠবার কোনো হেতুই ঘটেনি।

হঠাৎ অপর্ণা এল।

কেন এল?

তাদের দু'জনের জীবনের মধ্যে অকস্মাৎ নতুন করে কেন অপর্ণা এল? সে কি নিজেই এল? কে তাকে আনলে?

মৃত্যুর পরেও কি মানুষ থেকে যায়? ডাকলে সে আসে? সামনে দাঁড়িয়ে কথা কয়? এ কি সত্যি?

হঠাৎ কার করস্পর্শে সুমিত্রা চমকে উঠল। অস্ফুট চীৎকার করে পিছনে চেয়ে দেখে অপূর্ব তার কাধের উপর একখানি হাত রেখে ফিক ফিক করে হাসছে।

সুমিত্রা নিজেকে সামলে নিলে। তখনও তার বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করছিল। মুখে হাসি টেনে বললে, বস।

অপূর্ব পাশের চেয়ারে বসল।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—শোবার ঘরে।

—কি করছিলে?

—তোমরা শুইয়ে রেখে এলে। আমি শুয়েই রইলাম।

—ঘুমুচ্ছিলে?

—না।

সুমিত্রা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, এতক্ষণ ধরে চুপ করে শুয়ে ছিলে?

—আর কি করব?—অপূর্ব হাসলে।

—আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম, তুমি ঘুমুচ্ছ বুঝি।

—না।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, এখন কেমন বোধ করছ?

—ভালো।

—কোনো দুর্বলতা বোধ করছ না?

—তা করছি।

—শরীরে?

—শরীরের চেয়ে মনেই বেশি।

সুমিত্রা ওর চোখের দিকে চাইলে। দৃষ্টিতে বেশ দুর্বলতা রয়েছে। বললে, তোমার ওই ধ্যান-ধারণা ছেড়ে দাও।

অপূর্ব হাসলেঃ ছেড়ে দিয়ে কি নিয়ে থাকব? একটা কিছু অবলম্বন তো দরকার।

সুমিত্রা চুপ করে রইল! বলতে পারলে না, আমি তো আছি। বললে, আবার কোর্টে বেরোও।

—না।

—না কেন ?

—কোর্টে যেতে ভালো লাগে না।

—এতদিন তো লাগছিল।

—এতদিনও লাগছিল না। তবু করে যাচ্ছিলাম, 'রোগী যথা নিম খায় নয়ন মুদিয়া।'

অপূর্ব হাসলে।

ওর হাসিটা সুমিত্রার বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক মনে হল। বললে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি উত্তর দেবে ?

অপূর্ব আবারও হাসলে : উত্তর দিলে, আমি সাধারণত সত্যি সত্যি উত্তরই দিয়ে থাকি।

সুমিত্রা দ্বিধা করতে লাগল। প্রশ্নটা এখন করা সঙ্গত হবে কি না বুঝতে পারলে না।

অপূর্ব তাগাদা দিলে : কর, কি জিগ্যেস করবে।

সুমিত্রা সাহস পেলে : তুমি হঠাৎ সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে ধ্যান-ধারণায় মাতলে কেন ? আধ্যাত্মিক ব্যাধি তো তোমার ছিল না !

অপূর্ব হাসলে : তার আগে বল, কোন কর্মটা আমি পরিত্যাগ করেছি। যতদূর জানি, আমার দুটি কাজ ছিল। একটি পড়াশুনা অন্যটি ওকালতি।

—সেই দুটোর কথাই বলছি।

—ওকালতি পরিত্যাগ করেছি, ভালো লাগে না বলে। আর পড়াশুনা এখনও তো করি।

সুমিত্রা হাসলে! বললে, কর কিন্তু আগে যা পড়তে তা নয়। তোমার টিপয়ের উপর যত আধ্যাত্মিক বই।

—আধ্যাত্মিকতাকে তুমি ব্যাধি ভাবছ কেন ? যে সমস্ত মুনি-ঋষি বইগুলি লিখে গেছেন, পরবর্তীকালের মানুষে পড়বে বলেই নিশ্চয় লিখে গেছেন।

—কিন্তু সে আমাদের বয়সের মানুষের জন্যে নয় !

—কাদের জন্যে তবে? যাঁদের অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডম্, তাঁদের জন্যে?

—হ্যাঁ।

—না। তার প্রমাণ, যত লোক সন্ন্যাস নিয়েছেন তাঁদের পোনেরো আনাই যৌবনে নিয়েছেন। বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য,—কত নাম করব বল। ত্যাগ যৌবনেরই ধর্ম। বার্ধক্যে ত্যাগ করবার আছে কি?

—তুমি কি তাহলে সন্ন্যাসের জন্যে তৈরি হচ্ছ?

—না।

—তাহলে বাগান বাড়ি চলে গেলে কেন?

—গোলমাল ভালো লাগছিল না বলে। একটু নিরিবিলি থাকতে চেয়েছিলাম।

—লোকের মধ্যে এখানে তুমি আর আমি। গোলমালটা কিসের? আমার কাছে যারা আসে তাদের?

অপূর্ব চুপ করে রইল। তারপর বললে, তোমার কাছে কারা আসেন জানি না। তাঁদের দেখিনি কোনদিন। কিন্তু তাঁরা গোলমাল করেন বললে সত্যি বলা হয় না।

—তাহলে এখান থেকে পালালে কেন?

অপূর্ব জবাব দিলে না।

রামধন এসে জিজ্ঞাসা করলে, মা, রাত্রে বাবু কি খাবেন?

সুমিত্রা বললে, বাবু তো সামনেই রয়েছেন। তাঁকেই জিগ্যেস কর।

অপূর্ব নতমুখে কি যেন ভাবছিল। বললে, যা তোমাদের খুসি।

রামধন চলে গেলে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, সাধন-ভজন করে কিছু কি পেলে?

অপূর্ব মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল: বলব কেন?

—বলবে না? আমিও তো তোমার সহধর্মিণী। লাভে আমারও তো বখরা আছে।

—বখরা থাকলে এমনিতেই পেয়ে যাবে। চাইতে হবে না।

—বখরা চাইছি না। কি পেলে তাই জানতে চাইছি। একে কৌতূহল বলতে পার।

অপূর্ব জবাব দিলে না। অন্য দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত সকৌতুকে ওর দিকে চেয়ে থেকে সুমিত্রা আবার জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, মরা-মানুষকে সত্যি দেখা যায়? তার সঙ্গে কথা বলা যায়?

—কেন যাবে না?

—যেমন মানুষ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে, তেমনি?

—না। জেগে-জেগে যেমন দেখে তেমনি।

—কি বলে তারা?

—কারা?

—মরা-মানুষে?

—কথা ঠিক বলে না।

—তবে?

একটু ইতস্তত করে অপূর্ব বললে, সে আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। সকল কথা শেষ হয়ে গেলে যা থাকে, সেই কথা বলে।

—সে আবার কি?

অপূর্ব একটু চিন্তা করলে। বললে, তুমি তো নাচ?

নাচের প্রসঙ্গে এই প্রথম সুমিত্রা যেন অস্বস্তি বোধ করলে। বললে, হ্যাঁ।

—যখন নাচ, তখন তোমার পায়ের মঞ্জীর কথা বলে, জান?

—না।

—বলে। সেটা কোনো বিশেষ ভাষায় কথা নয়! সে শুধু সুর, শুধু ব্যঞ্জনা, শুধু আনন্দ। সে হল অনির্বচনীয়।

—বুঝলাম।

—কি বুঝলে?

—বুঝলাম, ও কিছু নয়। মায়া। মোহ। কিন্তু মরা-মানুষের কি দেহ থাকে।

—না।

—আত্মা কি দেখা যায়?

—না।

—তাহলে দেখ কি?

—তাকেই দেখি। মরা-মানুষের দেহ নেই, আত্মাকে দেখা যায় না, সবই ঠিক। তবু দেখা যায়। সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার সুমি। বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু, আমি বলছি, বিশ্বাস কর, মরা-মানুষকে দেখা যায়। তার সঙ্গে নিঃশব্দে, বিনা বাক্যবিনিময়ে কথা বলা যায়। সে আছে। মানুষ মরে না।

প্রবল কৌতূহলের জন্যেই হোক, অথবা অপূর্ব দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলছিল সেজন্যেই হোক, অপূর্ব যে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হচ্ছিল সুমিত্রা খেয়াল করলে না।

জিজ্ঞাসা করলে, আজ সমস্ত দিন তুমি তো ধ্যান-ধারণার দিক দিয়েও যাওনি। সে ছবিটাও এখানে নেই। আজ কি তুমি তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছ?

—না। কিন্তু মাঝে মাঝে অনুভব করি, তিনি আছেন, তিনি আমার কাছে-কাছে রয়েছেন···তিনি···

হঠাৎ অপূর্বর মুখভাব বদলে গেল। মুখ আরক্ত, চোখের তারা স্থির, সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত।

একটি মুহূর্তের ভগ্নাংশমাত্র সময়।

ভয় পেয়ে সুমিত্রা চীৎকার করে কি যেন একটা বলতে গেল। কিন্তু বলা আর হল না।

অপূর্বর অচৈতন্য দেহ একটা প্রচণ্ড শব্দে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

সুমিত্রা রামধনের কাছে রোগের বর্ণনা মাত্র শুনেছে। রোগের স্বরূপ চোখে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি।

মাটিতে পড়েই অপূর্ব ছটফট করতে লাগল। আরক্ত চোখে কালো কালো ভাঁটার মতো দুটো তারা ঘুরছে। মুখ দিয়ে লালা-স্রাব হচ্ছে। দাঁতে দাঁত সম্বদ্ধ। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। পায়ে পায়ে ছাঁদ লেগে গেছে। অস্ফুটে কি রকম একটা গোঁ গোঁ শব্দ করছে, আর মেঝেয় মুখ ঘষছে।

একটা ভয়াবহ দৃশ্য।

সুমিত্রার মনে হল, ঘরের আলো যেন অকস্মাৎ স্তিমিত হয়ে গেছে। দেয়ালে কাদের ছায়ারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরের হাওয়া অকস্মাৎ যেন জমে কঠিন হয়ে গেছে।

আর্তকণ্ঠে সে চীৎকার করে উঠল ঃ রামধন!

—যাই মা।

—শিগগির।

তার আর্ত-চীৎকারে রামধন ছুটে এল। প্রস্তুত হয়েই এল। সে বুঝতে পেরেছে কি ঘটেছে। একটা জগে করে জল নিয়েই এল।

এসেই অপূর্বর মাথাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল।

ওর চোখ-মুখের অবস্থা, কাৎরানি ও যন্ত্রণা সুমিত্রা সহ্য করতে পারছিল না। ভয়ে তার সমস্ত শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছিল। ছুটে বেরিয়ে এসে ঠাকুরকে হাঁক দিলে।

বললে, শিগগির গাড়ি নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে যাও। তাঁকে বোলো, বাবুর অসুখ। একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

ভয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু বাইরেও সে থাকতে পারলে না। আবার ছুটে ঘরে এল।

তখন সেই একই অবস্থা : সেই চোখের তারা ঘুরছে, হাতের খিঁচুনি, মুখ দিয়ে লালাস্রাব হচ্ছে, আর তার সঙ্গে সেই অব্যক্ত গোঙানি।

সবচেয়ে ভয়াবহ এই অব্যক্ত গোঙানি।

কি রকম একটা অপার্থিব শব্দ। ঘরের আবহাওয়াটাই বদলে দিয়েছে! ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা ভৌতিক আবেষ্টন। গা কি রকম ছমছম করে।

কতক্ষণ এই রকম চলল। মাথাটা কোলের মধ্যে আটকে ধরে রামধন চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে চলেছে।

হঠাৎ এক সময় অপূর্ব যেন শান্ত হয়ে গেল। চোখ বুঁজে এল, দেহের বাঁধন শিথিল হয়ে এল। সেই অব্যক্ত গোঁঙানিটাও বন্ধ হয়ে গেল।

মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে, ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে সুমিত্রা চীৎকার করে ডাকল : শুনছ! শুনছ!

কে শুনবে?

রামধন বললে, এখনও জ্ঞান হয়নি। এই রকম আরও দু'বার হবে। তারপর জ্ঞান হবে।

—আরও দুবার! তাহলে কি উনি বাঁচবেন?

এই রকমই হয় রামধন জানে। পরপর তিনবার এমনি দমকা আক্রমণ। সে জবাব দিলে না।

সুমিত্রা পাগলের মতো আবার ছুটে বেরিয়ে গেল।

চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর কি গেছে?

—গেছে মা।—ঝি সাড়া দিলে।

খবর পেলে ডাঃ ঘোষ মুহূর্তমাত্রও দেরি করবেন না, এই ভরসা নিয়ে সুমিত্রা ঘরে এল।

তখন আবার সেই কাৎরানি আরম্ভ হয়েছে। রামধন আবার ওর চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে।

সুমিত্রা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, এটা দ্বিতীয় বার ?

রামধন জলের ছাঁট দিতে দিতে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

আরও একবার। সুমিত্রা মনে মনে চিন্তা করলে। একবার ঘড়ির দিকেও চাইলে।

পুরোনো আমলের দেয়াল ঘড়ি। ডায়ালে একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ। তার আয়ত দুটি চোখের তারা পেণ্ডুলামের তালে তালে দোলে।

সুমিত্রার হঠাৎ কেমন মনে হল, ওই মেয়েটি অর্পণা। তারা নাচিয়ে ওকে যেন পরিহাস করছে !

ভয়ে সে ওদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলে।

দ্বিতীয় আক্রমন শেষ হল।

আবার সেই স্তব্ধ শিথিল ভাব।

এমন সময় বাইরের গাড়িবারান্দায় মোটর আসার শব্দ পাওয়া গেল। তাদের গাড়ি। নিশ্চয় ডাঃ ঘোষকে নিয়েই ফিরছে

সুমিত্রা ছুটে বাইরে গেল।

হাঁ, ডাঃ ঘোষকে নিয়েই ফিরছে। আগে ঠাকুর, পিছনে ডাঃ ঘোষ ক্লান্ত মন্থর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন।

সুমিত্রা ব্যাকুল ভাবে বললে, কাকাবাবু, আবার সেই অসুখটা ! কি ভয়ঙ্কর ! কি যন্ত্রনা !

সুমিত্রার পিছুপিছু ডাঃ ঘোষ উদ্বিগ্ন ভাবে ঘরে এসে অপূর্বর সন্নিকটে একখানি চেয়ার টেনে বসলেন।

তখন তৃতীয় আক্রমন আরম্ভ হয়েছে।

ডাঃ ঘোষ স্মেলিং সল্টের একটা শিশি পকেট থেকে বের করে অপূর্বর নাকের কাছে ধরলেন।

অপূর্ব ছটফট করে উঠল।

আরও দু'একবার ধরতে অপূর্ব যেন শান্ত হল। চোখ বন্ধ হল। হাতের মুঠি, পায়ের বাঁধন ধীরে ধীরে খুলে গেল।

তারপর আরম্ভ হল দুর্বল জড়িত কণ্ঠে অসংলগ্ন কথাঃ বলিনি? তোমাকে বলিনি? থেকে থেকে কোথায় যাও?

কয়েক মিনিট পরে তাও বন্ধ হল।

রামধন ডাকলেঃ বাবু! বাবু!

মনে হল অপূর্ব যেন সাড়া দিলে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চেয়ে উঠে বসল।

কিন্তু কেমন যেন স্তব্ধ। তখনও সম্পূর্ণ সম্বিৎ যেন আসেনি।

ডাঃ ঘোষ বললেন, একটু গরম দুধ আন।

দুধ খাওয়ার পর অপূর্বকে ধরাধরি করে শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু সে শুতে রাজি হল না। খাটের বাজুতে বালিসে ঠেস দিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল। তখনও যেন একটু ঘোর রয়েছে।

ডাঃ ঘোষ বললেন, হিস্টেরিয়া।

কে জানে কি? সুমিত্রার মনে হল অপূর্বর পুনর্জন্ম হল। বহু ভাগ্যে তাকে সে ফিরে পেলে।

ব্যাপারটা কি, ডাঃ ঘোষ বুঝিয়ে দিচ্ছেন, এমন সময় রামধন এসে জানালে, নিচে তিনজন বাবু অপেক্ষা করছেন।

ওদের কথা সুমিত্রা ভুলেই গিয়েছিল।

বললে, এখন যেতে বল।

নিচে কুণাল, অমল এবং বম্বের সেই ইম্প্রেসারিও অপেক্ষা করছিল। রামধন তাদের কাছে গিয়ে সুমিত্রার কথা জানালে।

ওরা হতবাক।

কুণাল অনুরোধ করলে, গিয়ে বল—বম্বের সেই সাহেব এসেছেন। তাঁর খুব তাড়া। আজকের প্লেনেই তাঁকে চলে যেতে হবে। সেই দলিলটা এখনই সই করা দরকার। বলতে পারবে?

—পারব।

রামধন আবার উপরে এল। ওরা যা বলেছিল, সুমিত্রাকে হুবহু জানালে।

পাশে ডাঃ ঘোষ। ঘরের মধ্যে অপূর্ব। সুমিত্রার কি রকম লজ্জা করছিল। বিরক্ত ভাবে বললে, বল গিয়ে ওসব এখন থাক। আমি ব্যস্ত আছি। এখন নিচে যেতে পারব না।

রামধন সেই কথা গিয়ে জানালে।

ওদের তিনজনেরই অবস্থা তখন ভেঙে পড়বার মতো।

এ কী কাণ্ড! সব ঠিকঠাক, এখন যেতে পারব না বললে চলবে কেন?

কুণাল রামধনের দুটি হাত ধরে সকাতরে বললে, আর একটি বার গিয়ে জিগ্যেস করে এস, আমরা ওপরে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি কি না।

এবার রামধনও বিরক্ত হল।

সুমিত্রার বিরক্তি সে স্পষ্ট লক্ষ্য করেছে। বললে, না বাবু, না। বরং তো এখন ওঁর সঙ্গে দেখা হবে না। ধমক খাবার জন্যে আমি আর ওঁর কাছে যেতে পারব না।

বলে আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে ভিতরে চলে গেল।

ওরা অবাক। হতভম্বের মতো পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগল। ঠিক করতে পারলে না, ওরা আরও অপেক্ষা করবে, না চলে যাবে। এমনি স্তব্ধভাবে কয়েক মিনিট কেটে যাবার পরে

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কারা যেন নেমে আসছে।

বেরিয়ে যাবার রাস্তা এই ঘরের মধ্যে দিয়েই।

কুণাল এবং অমল উঠে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে আগে প্রবেশ করলেন পক্ককেশ বৃদ্ধ ডাঃ ঘোষ। তার পিছনে সুমিত্রা।

যদিচ ঘরে আলো জ্বলছে, তবু কয়েকজন লোক যে সেখানে বসে আছে, সুমিত্রার যেন তা চোখেই পড়ল না। কোনো দিকে না চেয়ে সে ডাঃ ঘোষকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আবার ফিরল। সেই ভাবেই কোনোদিকে না চেয়ে, ব্যস্ত ভাবে।

কিন্তু কুণাল লাফিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল: সুমিত্রাদি!

সুমিত্রা চমকে উঠল। বললে, ভেবেছিলাম তোমরা চলে গেছ।

কুণাল বললে, চলেই যাচ্ছিলাম। এমন সময় সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ পেয়ে ভাবলাম, দেখাই করে যাই। এঁকে চিনতে পার?

বলে ইঙ্গিতে ইম্প্রেসারিওকে দেখাল।

সুমিত্রা করযোড়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, আপনার কাছে আমার যথেষ্ট ক্ষমা চাইবার আছে। আমার স্বামী খুব অসুস্থ। তাঁকে একলা ঠাকুর-চাকরের ভরসায় ফেলে রেখে বম্বে যাওয়া এখন আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

কুণাল বললে, বেশ তো, সময়টা মাস দুই পিছিয়ে দিয়েও তো কন্ট্রাক্টে সই করা যায়। ওঁর পক্ষে এই জন্যে আবার একবার খরচ করে আসা তো সম্ভব না।

সুমিত্রা ওর দিকে ফিরেও চাইলে না। ইম্প্রেসারিওকে বললে, তা বুঝি। কিন্তু কত মাস পিছিয়ে দিলে আমি যেতে পারব, তাও তো বুঝতে পারছি না।

ইম্প্রেসারিও বললে, বেশ তো। দু'মাস না হয় চার মাস পিছিয়ে দিন। বিনা কন্ট্রাক্টে ফিরে যেতেই আমার লজ্জা হচ্ছে।

সুমিত্রা কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করলে।

কুণাল, অমল এবং ইম্প্রেসারিও তাকে চিন্তা করতে দেখে আশ্বাসের আভাস পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল।

সুমিত্রা বললে, তাহলে আপনাকে বলি, আমার স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্যে পেশা হিসেবে এপথ আমাকে বোধ হয় ছেড়ে দিতে হবে। কাজেই আপনার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া কোনদিনই আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, আমার উপায় নেই।

এর পরে ইম্প্রেসারিওর আর কিছু বলবার রইল না।

তথাপি অমল কি যেন বলতে গেল। এমন সময় গাড়িটা ফিরে এল।

বাধা দিয়ে সুমিত্রা বললে, মিছিমিছি তোমাদের এবং আমার সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি বলে দিচ্ছি, গাড়িটা তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে। নমস্কার।

সুমিত্রার মনটা হালকা হয়ে গেল।

এটা যে সে পারবে, পারতে পারে, ততখানি শক্তি তার আছে, এ ভরসা তার নিজের মনেই ছিল না। কিন্তু পারলে। পেরে গেল। সেই খুশিতে অনেক দিন পরে মৃদুকণ্ঠে গানের একটা কলি ভাঁজতে ভাঁজতে তরতর করে উপরে উঠতে লাগল।

মাঝপথে রামধনের সঙ্গে দেখা।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে বললে, বাবু আপনাকে খুঁজছেন মা।

—বাবু? কি করছেন?

—খাটের উপর বসে আছেন।

নিজের উপর সুমিত্রার ভরসা বেড়ে গেছে।

হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে সুমিত্রা বললে, কই গো, বাবু নাকি আমাকে খুঁজছেন?

হাসির সংক্রামকতা আছে।

অপূর্বও হেসে ফেললে: না খুঁজিনি। ভাবছিলাম তুমি গেলে কোথায়?

—অর্থাৎ হারিয়ে গেলাম কি না?

সুমিত্রা একটা কটাক্ষ হানলে।

—ঠিক তাই। চক্ষের পলকপাতে তোমরা হারিয়ে যাও। তখন আমরা অন্ধকার দেখি।

—আলো জ্বেলে রাখ না কেন?

—আলো? 'যতবার আলো জ্বালাতে যাই, নিভে যায় বারে বারে।' জান, পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় ট্রাজেডি আর নেই।

বাইরের দিকে চেয়ে অপূর্ব হাসলে।

সেখানে নারিকেল গাছের ফাঁকে একফালি চাঁদ উঠেছে। তারও মুখে বাঁকা হাসি।

সুমিত্রা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। হঠাৎ তার চোখ ছলছল করে উঠল। কেঁপে উঠল গলার স্বর।

দুই হাত জোড় করে বললে, আর কখনও হারাব না। বিশ্বাস কর। কথা দিলাম।